কাঙালিনী

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়



অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়, ১৩৬৫

প্রকাশক :
অমরেন্দ্র দত্ত
অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

ব্লক ও মুদ্রণ :
অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট :
বিভূতি সেনগুপ্ত

বাঁধিয়েছেন :
শ্রীকৃষ্ণ বাইণ্ডিং ওআর্কস
কলিকাতা-৯

মূল্য—তিন টাকা

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

॥ চিহ্ন ॥

বয়স বড় জোর বছর পাঁচেক, কিন্তু দাপটে প্রতাপাদিত্যকে হার মানায়। ভয়ে তিন বোন তটস্থ। মা ছেলেকে সর্বদা চোখে চোখে রাখেন। একটু চোখের আড়াল করলেই ঠিক একটা না একটা কুকর্ম করে বসে আছে। হয় বোনদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি, নয় তো টুল সরিয়ে এনে জানলার-তাকে-রাখা ঘড়িটা পেড়ে তাতে দম দেবার চেষ্টা। আলতার শিশি ভেঙে নিজের জুতোয় মাখানো। মতলবের যেন আর শেষ নেই। ওইটুকু তো মাথা, অথচ এত ফন্দিফিকির জোটে কোথা থেকে।

কিছুক্ষণ সাড়াশব্দ না পেলেই রান্নাঘর থেকে মা চেঁচান, ওরে, দস্যিটার কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না কেন? কি সর্বনাশ করছে একবার দেখ্।

সাইরেনের-শব্দ-কানে-আসা পুলিসের মতন তিন বোন হাতের কাজ ফেলে তিন দিক থেকে ছুটে আসে। তন্ন তন্ন করে খোঁজে, আলমারির পিছন, টেবিলের তলা, বাপের বুককেসের পাশ। না, কোথাও নেই। বড় বোন ছাদের সিঁড়ি অবধি ঘুরে আসে। ছাদের দরজায় তালা দেওয়া। পাছে ছেলে ছাদে উঠে আলসে ধরে ঝোঁকে তাই এই ব্যবস্থা। যখন যার ছাদে যাওয়ার প্রয়োজন, তালা খুলে তবে যেতে হয়।

হঠাৎ কথাটা মেজ বোনের মনে পড়ে যায়। বড় বোনের দিকে চেয়ে বলে, দিদি, বাগানে নেই তো?

বাগানে। সঙ্গে সঙ্গে তিন বোন চৌকাঠ পার হয়ে বাগানে গিয়ে ঢোকে।

ওই নামেই বাগান। বাড়ির পাশে এক চিলতে জমি, বড জোর হাত দশেক। তাই বেড়া দিয়ে ঘিরে বাগান কবাব প্রযাস। বাড়ির কর্তাব শখ। গোটা কতক পাতাবাহাবী, কিছু বেল জুঁই আব একটা পাতিলেবুব গাছ। যত্নের অভাবে, জলেব অভাবে বেশীর ভাগ গাছই স্বল্পায়ু। বসানোব প্রথম প্রথম খুব আদর-যত্নের ঘটা, বাড়িব সকলেই এক এক ঘটি জল ঢালে, তাবপব একদিন উৎসাহ মিইযে আসে। নতুন কোন শখেব জোযাবে পুবনো নেশা ভেসে যায।

প্রথমে দেখতে পেল ছোট বোন শোভা। নিচু হযে লেবু-ঝাড়ের দিকে আঙুল দেখিযে বলল, ওই দেখ দিদি, কোথায গিযে বসে আছে।

অন্য দুই বোন উঁকি দিযে দেখেই কপালে হাত চাপড়াল, কি সর্বনাশ, বাবা জানতে পাবলে আব বক্ষা বাখবে না।

ওই দূর থেকেই তিন বোন হা হুতাশ কবল, কিন্তু কাছে কেউ গেল না। কে যাবে? সবাইযেবই তো প্রাণেব ভয বযেছে। আঁচড়ে কামড়ে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড কববে। বলা যায না, হাতেব টিনেব মগ ছুঁড়ে মাবাও বিচিত্র নয।

তার চেযে হেড কোযার্টাবে খবব দেওযাই সমীচীন। তিন বোন আবাব বান্নাঘবেব দিকে ছুটল একসঙ্গে চিৎকাব কবতে কবতে।

মা, মা, কাল বাবা যে শিউলিব চাবাটা এনে বসিযেছিল, তাব দফা শেষ। জল ঢেলে ঢেলে তাকে মাটিতে শুইযে ফেলে তাব ওপর ইঁট চাপা দিযেছে।

ফুটন্ত কড়াটা আঁচল দিযে চেপে মেঝেয নামিযে বেখে মা ছুটে এলেন।

তিন মেয়ের পর ওই ছেলে। সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছিল।

আর বোধ হয় কিছু হবে না, হলেও আবার একটি মেয়ে। কিন্তু সকলের সন্দেহ ব্যর্থ করে খোকন হয়েছিল। খুব সহজ নয়, প্রায় একমাস যমে-মানুষে টানাটানি! প্রসূতির প্রাণ যাবার দাখিল। কিন্তু চোখজুড়নো ছেলে। যে দেখেছে সে-ই স্বীকার করেছে। ছেলে তো নয়, রাজপুত্র। টুকটুকে রঙ, টানা চোখ, নীলচে চোখের তারা, আঙুরের থোকার মত একমাথা চুল, মরীচ-রাঙা ঠোঁট। চেয়ে চেয়ে বাপ-মায়ের যেন আর আশ মেটে না।

বাপ-মার চেহারা নিন্দেব নয়। বাপের বয়স চল্লিশের চৌকাঠ সবে পেরিয়েছে, কিন্তু দেখে মনে হয় পঁয়ত্রিশের ধারে কাছে। এখনও গিন্নী সেজে-গুজে বেরুবার মুখে কর্তা ঠাট্টা করেন, দাঁড়াও গো, রাস্তায় বেরুবার আগে তোমার আঙুলটা কামড়ে দিই। পথেঘাটে আমীর লোক তো আর কম ঘোরাফেরা করে না! কখন কার নজরে পড়ে যাবে, তখন এ গরিবের দিকে আর ফিরেও চাইবে না।

গিন্নীর দু গালে আবীরের রঙ, ভ্রূ কুঁচকে কালো চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক হানেন, কি যে রসিকতা কর বাপু, ভাল লাগে না। বয়স বাড়ছে, না, কমছে? বড় মেয়ের বয়স যে বারো পেরিয়ে তেরো হবে সামনের বোশেখে। আর কিছুদিন পরে জামাই আসবে যে!

তা আসুক না। কর্তা বেপরোয়া, তখন জামাইয়ের মার সঙ্গে রসিকতা শুরু করব।

কর্তা বিজয়বাবু আমীর না হোন, ফকির নন তা বলে। বেসরকারী অফিসের বড়বাবু। প্রায় তিন পুরুষের চাকরি। মাইনে ভাল, অফিসে খাতিরযত্নও খুব। পৈতৃক বাড়ি আছে শহরে। আগে খান দুয়েক ঘর ছিল, বিজয়বাবু বাড়িয়ে খান পাঁচেক করেছেন। দোতলার চিলেকোঠায় একটা। শৌখিন লোক। হাতে বাড়তি টাকা পেলেই টুকিটাকি সংসারের

জিনিসপত্র কেনেন। জানলা-দরজার পর্দা, টেবিল-চেয়ারের ঢাকা। মাঝে মাঝে কাঠের ছোটখাটো আসবাব। মেয়েদের জন্যে একটা টেবিল-হারমনিয়মও কিনেছেন। গান শিখবে মেয়েরা, আজকাল গান না জানলে নাকি বিয়ের বাজারে অচল।

গিন্নী অপর্ণা প্রায়ই অনুযোগ করেন, কি ব্যাপাব বল তো তোমার! হাতে পয়সা থাকলে হাত নিশপিশ করে, না? এই তো সেদিন পর্দার কাপড় আনলে একগাদা, আবাব আজকে এ ছিট আনলে কিসের জন্যে?

বিজয়বাবু হাসেন, কি যে বল গিন্নী, বিজয় বসাকের বাড়িতে সারা মাস এক পর্দা ঝুলবে? পাড়াপড়শীরা বলবে কি? বলবে, তিরিশটা দিন এক পর্দা বাখা মানে আব্রু বাখতে গিয়ে নিজেকে বে-আব্রু করা। ধোবার খরচ জোগাতে পারে না, বাহাবের শখ!

হ্যাঁ, পড়শীদেব তো তোমার চিন্তায় ঘুম নেই। অপর্ণার গজগজানি থামে না। বিজয়বাবু বেগতিক দেখে অন্য পথ ধবেন, তাছাড়া কাপড়টা দেখেছ একবাব। নতুন আমদানি। দোকানে বলা ছিল, জিনিসটা আসতেই অফিসে ফোন করেছে।

কাপড় অবশ্য ভাল। ফুলেব নক্‌শা। বঙটাও চমৎকাব! কিন্তু কাপড় পছন্দসই বলে এ রকম অহেতুক মুঠো মুঠো টাকা খরচ করতে হবে প্রতি মাসে! মেয়েবা বড় হচ্ছে না? এক-এক মেয়ে পার করা মানে এক-এক কলসী টাকা ঢালা। সে খেয়াল আছে? মেয়েছেলের বাড় তো কলাগাছেব বাড। একবাব ফ্রকের খোলস ছেড়ে শাড়ি ধরলে আব দেখতে হবে না। লকলকে পুঁইলতার মতন বয়সের মাচা ডবিয়ে ফেলবে।

অপর্ণা মুখ ফুটে কথাটা বিজয়বাবুকে বলেই ফেললেন; তিন মেয়ের বাপ, সে খেয়াল আছে?

বিজয়বাবু নির্বিকার। মুখের হাসি অম্লান; তা আছে বই কি। তুমি কি ভেবেছ আমি হাত গুটিয়ে বসে আছি! অত

টাকার লাইফ ইনসিওর করেছি কিসের জন্যে? তাছাড়া, একেবারেই টাকা জমাচ্ছি না কে বললে?

তাহলেও এ রকম বাজে খরচ করার কোনো মানে হয়?

বিজয়বাবু কপালে হাত চাপড়ালেন, হায় রে, পর্দা ঘিরে বৃথাই তোমায় পর্দানশীন করার কসরত করছি! তোমার কথাবার্তায় আধুনিকার ছোঁয়াচ! স্বামীকে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা!

এমন মানুষকে কিছু বলতে যাওয়া ভস্মে ঘি ঢালা। কোন কথাই কানে তোলেন না।

অবশ্য শুধু পর্দার কাপড় কিনেই কর্তব্য শেষ করেন না। ছুটির দিন নিজের হাতে জানলায় জানলায় সে পর্দা টাঙানো হয়। পনেরো দিন অন্তর সমস্ত ছবি নামিয়ে ঝাড়পোঁছ। সপ্তাহে একদিন ঝুল ঝাড়া। সব দিকে বিজয়বাবুর সজাগ নজর। আলনা থেকে একটা কাপড় এদিক ওদিক হলে বিরক্ত হন। নিজের হাতে আবার সব গুছিয়ে রাখেন। পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে মেয়েদের প্রায়ই জ্ঞানগর্ভ কথা শোনান। নিজের এলাকা ডিঙিয়ে মাঝে মাঝে রান্নাঘরেও এসে ঢোকেন। সেদিন অপর্ণার অবস্থা কাহিল।

ইস, ওদিকের কোণে কি মাকড়সার জাল হয়েছে! ঝাড়তেও পার না ওগুলো?

সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণা হাত জোড় করেন, দোহাই তোমার, এখন লাঠি-সোঁটা এনে জাল পরিষ্কার করতে যেও না, ভাত তরকারি সব নষ্ট হবে। কাল আমি সব ঝেড়ে পুঁছে রাখব।

বিজয়বাবু আর এগোন না, কিন্তু চৌকাঠে বসে বসে স্বাস্থ্য-নীতির বাণী আওড়ান। মাকড়সা আর মাছি যে কি মারাত্মক প্রাণী সে সম্বন্ধে অপর্ণাকে ওয়াকিবহাল করার প্রয়াস।

এতদিন পর্যন্ত কোন অসুবিধা হয় নি। তিন মেয়ে বাপের উপদেশ মর্মে মর্মে পালন করেছে। ঘরের মেঝেয় কাগজের কুচিটি পর্যন্ত পড়ে থাকে না। বাপ আসবার আগেই সব ঝকঝকে

তকতকে। এমন স্বামীর সঙ্গে থেকে থেকে অপর্ণাও ফিটফাট হয়েছে। সময় পেলে পালিশের টিন পেড়ে নিজের হাতেই চেয়ার টিপয় পালিশ করতে বসে। ব্রাসো ঘষে ঘষে চকচকে করে তোলে সেলাইয়েব মেসিন।

কিন্তু ছেলে বড় হবার পব থেকেই সব ওলট-পালট। কোন জিনিস ঠিক জায়গায় থাকে না। নিজের জুতো-জোড়া ঈজি-চেয়ারের ওপর। মা আপত্তি জানালে খোকন নিস্পৃহ গলায় বলে, থাক্, ঘুমুচ্ছে। বাপের আসাব পথে কাত-হওয়া অবস্থায় টুল পড়ে থাকে, মাথার চিরুনি আব ব্রাশ যখন যে-কোন জায়গায় পাওয়া যেতে পাবে।

বোনেদের কথা তো গায়েই মাখে না, মাও প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে, কেবল একটু যা ভয় করে বাপকে।

খোকন, আমাব খবরের কাগজটা কোথায় গেল? ঈজি-চেয়াবে শুয়ে বিজয়বাবু খোঁজ কবেন।

নীল দুটি চোখে অগাধ বিস্ময়। খববেব কাগজ কোন দিন দেখেছে মুখচোখেব ভাবে এমন মনে হল না। ভ্রূ দুটো তুলে বাপের হাঁটুব কাছ ববাবর দাঁড়িয়ে রইল।

বিজয়বাবু আর একবাব চেষ্টা করলেন, খবরের কাগজটা নিয়ে এস তো খোকন, আমি পড়ব একটু।

খোকন অনেকক্ষণ বাপেব দিকে চেয়ে রইল, তাবপর ঘাড় নেড়ে বলল, না।

না মানে?

নেই। খোকন আরও সহজ হবার চেষ্টা করল।

নেই কি? সকালে টেবিলের ওপর বেখে গেছি যে! বিজয়বাবু ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সকালে সাত তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুঁজে অফিসে ছুটতে হয়, ভাল কবে কাগজ পড়ার অবকাশই পান না। সন্ধ্যার ঝোঁকে চোখ বোলান।

খোকন বাপের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেল। বুঝতে পারল, বাপের মেজাজ সুবিধার নয়। নিজের কান দুটো তাঁর হাতের আওতার মধ্যে রাখা সমীচীনও নয়, নিরাপদও নয়।

খুব আস্তে খোকন বলল, মিঁউ। মিঁউ শুয়েছে।

বিজয়বাবু প্রমাদ গুনলেন। কাগজ যে চট করে পাবেন না, সেটুকু বুঝতে অসুবিধা হল না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল দেখি কোথায় কাগজ! দেখাও আমাকে।

খোকন আগে আগে চলল। বাপের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। সকলের পিছনে তিন বোন।

সিঁড়ির নিচে খোকনের এলাকা। রাজ্যের পাথর নুড়ি, সিগারেটের বাক্স, গাছ পাতা সব জড় করা। এখানে অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ। বোনেরা তো ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না। মাসে একবার করে বিজয়বাবু নিজের হাতে সব পরিষ্কার করেন। কিন্তু বড় জোর দিন দুয়েক। তারপরই একটু একটু করে খোকনের সংসার আবার জমে ওঠে।

সিঁড়ির কাছ বরাবর গিয়ে খোকন নিচু হয়ে দেখাল : ওই যে।

বিজয়বাবু গুঁড়ি মেরে বিশেষ কিছু দেখতে পেলেন না। এদিকটায় আলো কম। দালানের বাতি এত দূর এসে পৌঁছয় না। মেয়েরা কিন্তু ঠিক দেখতে পেল।

বড় মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওই যে বাবা, তোমার খবরের কাগজটা পেতে একটা বেড়ালকে শুইয়েছে।

বিজয়বাবু বেড়াল সরিয়ে খবরের কাগজ উদ্ধার করলেন। কাদামাখা নোংরা এক বেড়াল। রাস্তায় পড়ে পড়ে ধুঁকছিল, খোকন তাকে দুধের লোভ দেখিয়ে বাড়িতে এনে তুলেছে। বিজয়বাবু তখনই বেড়ালটাকে ফটকের বাইরে দিয়ে এলেন। পাপ চুকল, কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না তাতে। অকৃতজ্ঞ বেড়াল নখের আঁচড়ে খবরের কাগজ ছিঁড়ে কুটি কুটি করেছে। পড়া

সম্ভব নয়। বিজয়বাবু মুচড়ে কাগজটা বাইরে ফেলে দিলেন। বহু কষ্টে খোকনের সন্ধান মিলল। ঘরের কোণে গোটানো মাতুরের পিছনে লুকিয়ে বসে ছিল, বিজয়বাবু কান ধরে টেনে বের করলেন। বেশ করে কান মলে দিয়ে তু'গালে তুটি চড়। খোকন কাঁদল না। লাল ঠোঁট অভিমানে উলটে গেল, নীল তুটি চোখ জলে টলমল। দেয়ালে পিঠ দিয়ে অনেকক্ষণ ফোঁপাতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাইরের ঘরে বসে থেকে বিজয়বাবু বেরিয়ে গেলেন। কাজ কিছু নেই, কিন্তু ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগল না। একবার মনে করলেন, ও ভাবে তুটো চড় না দিলেই ভাল হত। কান মলে দিয়েছেন এই তো যথেষ্ট। তারপর চলতে চলতে ভাবলেন, না, শাস্তি ঠিকই হয়েছে। আনকোরা নতুন খবরের কাগজ নিয়ে খেলা করা যে কতখানি অন্যায় তা বুঝুক। ভবিষ্যতে সাবধান হবে।

বিজয়বাবু যখন ফিরলেন তখন খোকন ঘুমে অচেতন। অপর্ণা বাইরের ঘরে বসে বুনছিলেন, বিজয়বাবু কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

খোকন ঘুমিয়েছে ?

হ্যাঁ, কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি বেরিয়ে যাবার পরই খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।

জুতো খুলে বিজয়বাবু পাশের চেয়ারে বসে পড়লেন, একটু ইতস্তত করে বললেন, খোকন খুব কান্নাকাটি করছিল বুঝি ?

খুব নয়, একটু করছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় ফোঁপাচ্ছিল।

বিজয়বাবু তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চোখ ফেরালেন, খুব আস্তে বললেন, মারাটা একটু বেশীই হয়ে গিয়েছে। কি করব, জিনিসপত্র অগোছাল করলে আমার জ্ঞান থাকে না।

আর ছেলেটা তুরন্তও হয়েছে তেমনি। একটা-না-একটা

কুকর্ম করছেই সারাদিন। ভাবি তো মারব না, কিন্তু রাগের মাথায় আমিও মেরে বসি এক-এক দিন।

না না, মারধোর করা ঠিক নয়। এ বয়স থেকে মারধোর করলে বিগড়ে যাবে ছেলে। ওসব না করে বরং ওকে বোঝানো উচিত। বাড়ির জিনিসপত্র উল্টোপাল্টা করা যে ঠিক নয়, সেটা ওর মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া ভাল।

কাল থেকে তুমি বোঝাবার চেষ্টা কর, আমার দ্বারা হবে না। চেয়ার ছেড়ে অপর্ণা উঠে পড়লেন।

শুতে যাবার আগে বিজয়বাবু ঘুমন্ত খোকনের কাছে এসে দাঁড়ালেন। ঝুঁকে পড়ে নিরীক্ষণ করলেন অনেকক্ষণ ধরে। কানটা যেন একটু লালই মনে হচ্ছে। গালে কোন দাগ নেই। ঘামে ভিজে চুলগুলো কপালের ওপর লেপটে গেছে। দুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করা।

অবশ্য রাগ একটু হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। অফিস যাবার সময়ে কোন রকমে হেডলাইনগুলোর ওপর নজর বুলিয়ে স্নান করতে ছুটতে হয়। ভাল করে কাগজটা পড়েন ফিরে এসে। পড়বার মতন খবরও ছিল। অফিসের লোকেরাই বলাবলি করছিল। মেননের বক্তৃতা। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে। তাই বাড়ি ফিরেই কাগজটার খোঁজ করেছিলেন। টেবিলের ওপর কাগজ থাকে আজ দশ বছরের বেশী। কোন দিন একটু এদিক-ওদিক হয় নি। তাই জায়গায় কাগজ না পেয়ে মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। শুধু কি তাই, কাগজটার এমন অবস্থা হয়েছে যে একটি পাতা পড়বার উপায় নেই। যে পাতাটা ছেঁড়ে নি, তাতেও কাদা মাখামাখি।

বিছানায় শুয়ে বিজয়বাবু এ-পাশ ও-পাস করলেন। নিজেকেই একটু সাবধান হতে হবে। খোকনের নাগালের বাইরে খবরের কাগজটা তুলে রাখলেই হবে। জানালার মাথায়। এ কথার

পাশাপাশি আরও একটা কথা বিজয়বাবুর মনে পড়ে গেল। খবরের কাগজের ব্যাপারটার না হয় সুরাহা হল, কিন্তু কচি ছেলে বেড়াল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে এও তো ঠিক নয়। বেড়ালের লোম থেকে মারাত্মক সব অসুখ হয়। খোকনকে মেরে ভালই করেছেন। এবার থেকে সাবধান হয়ে যাবে। এমন কাজ আর করবে না।

দিন দুয়েক। খোকন যেন একেবারে বদলে গেল। মার কোলের কাছে বসে প্রথম ভাগ নিয়ে পড়াশোনা করল। দুপুর বেলা মার পাশে শুয়ে ঘুমোবারও চেষ্টা করল। কিন্তু ওই দু দিন। তারপর যে-কে-সেই। সকালে উঠেই ছোটদির সঙ্গে পুতুল নিয়ে একচোট হয়ে গেল। চুল টেনে, জামা ছিঁড়ে বিপর্যয় কাণ্ড। বড়দি শাসন করতে এসেছিল, বাপের লাঠি নিয়ে তাকে তাড়া করল। রান্নাঘর থেকে অপর্ণা সমানে চিৎকার করে গেলেন, কিন্তু খোকনের ভ্রূক্ষেপ নেই। এ সময়ে অপর্ণার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসাও সম্ভব নয়। মানুষটা স্নান করতে গেছে। এলেই থালা সাজিয়ে সামনে ধরতে হবে। তার পরেই মেয়েদের স্কুলের বাস দাঁড়াবে। তার মধ্যে শুধু মেয়েদের খাওয়ানোই নয়, তাদের টিফিনবাক্সও ভরে দিতে হবে।

এ সব খবর খোকনের জানা। রান্নাঘর থেকে শুধু গর্জনই হবে, বর্ষণের কোন সম্ভাবনা নেই, এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত।

মাসখানেক পর। বিজয়বাবু অফিস-ফেরত বাড়িতে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালেন।

খোকন, খোকন!

অপর্ণা ভিতরের দিকে ছিলেন, বিজয়বাবুর গলার আওয়াজে সামনে এসে দাঁড়ালেন। কি হল?

খোকন কোথায়?

বিজয়বাবুর হাত থেকে জিনিসগুলো নিতে নিতে অপর্ণা বললেন, খোকন বাড়িতে নেই। কেন বল তো ?

বাড়িতে নেই ? কোথায় গেছে ? বিজয়বাবুর গলার স্বর থমথমে।

প্রীতির মেয়ের আজ জন্মদিন। ওদের বাড়ির চাকর এসে সবাইকে নিয়ে গেছে। কেন, খোকনকে কি দরকার ?

কি দরকার ? বিজয়বাবু দেয়ালের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন, ওই দেখ।

অপর্ণা ফিরে দেখলেন। দরজার পাশে দেয়ালের ওপর লাল পেন্সিলে বড় বড় করে লেখা, অ, ই আর ক। কার হাতের লেখা চিনতে একটুও অসুবিধা হল না। খোকন বর্ণপরিচয়ের জ্ঞান দেয়ালে লিপিবদ্ধ করেছে বাপের পেন্সিল দিয়ে। বেশ গোটা গোটা অক্ষরে।

বিজয়বাবু সামনের চেয়ারে বসে পড়লেন। বিরক্তির রেশ মিশিয়ে বললেন, এই সেদিন চুনকাম হল। সারা বাড়িটা কলি-ফেরানো। মেয়েদের আমি পই পই করে বারণ করি, দেয়ালে ঠেস দিয়ে পর্যন্ত বসতে দিই না, পাছে দেয়ালে তেলের দাগ লাগে। আর দেখ তোমার ছেলের কাণ্ড !

অপর্ণা প্রথমে কিছু বললেন না। এখন বলতে গেলেই মানুষটা রেগে যাবে। খোকন কখন যে এসব করেছে, তিনি কিছুই জানেন না। দুপুরে তিনি ঘুমিয়ে পড়ার পর, ড্রয়ার থেকে বাপের পেন্সিল বের করেছে, তারপর বসে বসে লিখেছে।

অনেকক্ষণ পরে অপর্ণা বললেন, জল দিয়ে ধুলে বোধ হয় উঠে যেতে পারে।

কিছু একটা করতে হবে। বাইরের ঘরের দেয়ালে ওসব হিজিবিজি থাকলে তো চলবে না। ও ঘরেই লোকজন সব এসে বসে। বাইরের সব ভদ্রলোক।

অপর্ণা আর একবার চেয়ে চেয়ে দেখলেন। অবশ্য এমন কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না। বাইরেব লোকের চোখে বিসদৃশ ঠেকার মতনও কিছু নয়। কিন্তু সে সব কথা বললেই বিজয়বাবু চটে উঠবেন। খুঁতখুঁতে লোক। কোথাও একটু কালির ছিটে কিংবা দাগ থাকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন।

একবাব অপর্ণার মনে আছে। কলম থেকে এক ফোঁটা কালি পড়েছিল চেয়ারের হাতলে। বিজয়বাবুরই হাত থেকে। তখনই গরম জল আর সোডা দিয়ে ঘষা হল। তাতেও পরিষ্কার হল না। অস্পষ্ট কালির ছোপ তখনও লেগে রইল। বিজয়বাবু সেই রাত্রে ছুরি দিয়ে আস্তে আস্তে চাঁছলেন চেয়ারেব হাতল, তারপব পালিশের টিন পেড়ে পালিশ লাগানো হল। সব শেষ হতে বাত প্রায় সাড়ে বারোটা।

অপর্ণা খুব আস্তে আস্তে বললেন, একটা কাজ কবলে হয়।

কি ?

কিছু চুন তো রয়েছে ঘরে। এব ওপবে লেপে দিলে হয়।

তাহলে কি ভাল দেখাবে! বাড়তি একটা পোঁছ। ঠিক মিলিয়ে কি আমরা দিতে পাবব ? বিজয়বাবু সন্দেহ প্রকাশ কবলেন।

কাল দুপুরবেলা আমি চেষ্টা করে দেখব একবাব।

না না। বিজয়বাবু ঘাড় নাড়লেন, তুমি পাববে না। খুব সাবধানে দিতে হবে। বেশী হয়ে গেলেই বিশ্রী দেখাবে। আমিই ববং অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি এসে একবাব বসব। তুমি চুন গুলে ঠিক করে রেখো। ব্রাশও আছে তো ?

হ্যাঁ, আছে। অপর্ণা সেখান থেকে সবে গেলেন। ছেলেটাকে নিয়ে তিনিও বিব্রত হয়ে পড়েছেন। একটা কথা যদি কানে তোলে! কেমন যেন বংশছাড়া গোত্রছাড়া হয়েছে! বাড়ির মানুষটা যা অপছন্দ করে, বেছে বেছে ঠিক তাই করাতেই খোকনের আনন্দ।

সেদিন রাত্রে আর বিজয়বাবু কিছু বললেন না। শাস্তি হল পরের দিন ভোরে। ছড়ি দিয়ে বেশ কয়েক ঘা। তারপর কান ধরে কোণের দিকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। যাবার সময়ে বলে গেলেন, ভাত বন্ধ।

অপর্ণা অবশ্য এতটা করলেন না। মেয়েরা স্কুল যাবার পর ছেলেকে কাছে ডেকে বোঝাতে শুরু করলেন। ছড়ির দাগ পিঠের ওপর লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে অপর্ণা অনেক কথা বললেন। বাড়ির দেয়াল নোংরা না করার উপদেশ, এমনভাবে নিজেদের ঘরদোর নষ্ট না করা। খোকন মাথা নিচু করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, আর করব না।

অপর্ণার এক জ্বালা। ছেলেকে মারধোর করার কিছুদিন পর্যন্ত বাপের মুখ ভার। বাড়ির সবাইকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন। পাবতপক্ষে খোকনের মুখোমুখি হন না। সময়ে খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত বিজয়বাবুর বন্ধ। দু দিকের ঝক্কি সামলাতে হয় অপর্ণাকে।

খোকনও দিনকতক এড়িয়ে চলে বাপকে। শান্ত সুবোধের মতন দিন কাটায়। আবার যে-কে-সেই।

সেদিন দুপুরে আচমকা বৃষ্টি এল। কালবোশেখীর ব্যাপার। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ আকাশের বুকে মেঘ জমে উঠল। জমাট কালো মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি। তারপর তুমুল বর্ষণ। মেয়েরা স্কুলে।

অপর্ণার তন্দ্রা এসেছিল, জেগে উঠে তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করতে গিয়ে চোখ কপালে তুললেন। পিছনের ছোট দরজা দিয়ে খোকন কখন বেরিয়ে পড়েছে। বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মহানন্দে ভিজছে।

অপর্ণা মাথায় আঁচল টেনে দিয়ে ছুটে বাইরে গেলেন।

খোকনকে টেনে আনলেন ঘরের ভিতর। গামছা দিয়ে আপাদ-মস্তক মুছিয়ে হিড়হিড় করে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। মশাবির চালে হাতপাখা ছিল, তারই বাঁট দিয়ে উত্তম-মধ্যম মাবতে শুরু কবলেন। দু জায়গায় কেটে রক্ত বেরোতে অপর্ণাব খেয়াল হল। মার থামিয়ে ছেলের সেবায় মন দিলেন।

জ্বর এল সন্ধ্যার ঝোঁকে। গা যেন আগুন, হাত বাখা দায়। লাল ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

বিজয়বাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অপর্ণাব দিকে ফিবে বললেন, বড় ভাল ঠেকছে না। মডার্ন ফার্মেসিব ডাক্তাবকে একবাব ডেকে নিয়ে আসি।

অপর্ণা উত্তব দিলেন না। পাথরের মতন চুপচাপ বসে বইলেন ছেলেব শিয়রে। অসময়েব বৃষ্টি। ভিজলে জ্বরজ্বারি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অপর্ণার মন মানল না। শুধু কি জলে ভিজেই শরীব খাবাপ হয়েছে খোকনেব। পিঠের দাগগুলো এখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কালশিটে পড়ে গিয়েছে।

ডাক্তাব এলেন আটটা নাগাদ। বুকে পিঠে যন্ত্র বসিয়ে অনেকক্ষণ ধবে দেখলেন। চোখেব পাতা উলটিয়ে, থার্মমিটাব দিয়ে। পিঠেব দাগগুলো দেখে শিউবে উঠলেন। বিজযবাবুব দিকে ফিবে বললেন, পিঠের ওপব ও দস্তখতগুলো কাব, বাপেব, না, মায়েব?

বিজয়বাবু অপর্ণাব কাছে সবই শুনেছিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, ছেলেটা বড্ড দুষ্টু হয়েছে। কাবও কথা শোনে না।

ছেলেপিলে একটু দুষ্টু-ই হয়, তা বলে ও-বকম চোবেব মাব মারতে হবে?

হাতব্যাগ তুলে নিয়ে ডাক্তাব বাইরে চলে এলেন। বিজযবাবু পিছন পিছন।

একটা মিক্সচার, দুটো বড়ি দু' ঘণ্টা অন্তব। এখন কিছু বলা

সম্ভব নয়। অন্তত: তিন দিন না কাটলে ডাক্তার কিছু বলতে পারবেন না।

তিন দিনের দিন অবস্থা চরমে। খোকন নেতিয়ে পড়ল। কাগজ-সাদা মুখের রঙ। দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট ছিঁড়তে লাগল।

বিজয়বাবু ছুটি নিয়েছিলেন। ব্যাপাব দেখে তখনই ডাক্তারেব কাছে ছুটলেন। ফিবলেন ফিরিঙ্গী ডাক্তার কুপাবকে সঙ্গে নিয়ে। বোগী ছুঁলেই চৌষট্টি টাকা। লোকে বলে, ধন্বন্তবি। তুলসীতলায় নামিয়ে-রাখা মুমূর্ষুকে নতুন জীবন দেন। খোকনকে দেখে কিন্তু কোন আশাই দিতে পাবলেন না।

অপর্ণাব কান বাঁচিয়ে বিজয়বাবুকে ফিসফিসিয়ে বললেন, আপনাকে মিথ্যা আশা দিতে চাই না মিস্টার বসাক। বোগী আমাদেব হাতেব বাইরে। তুটো লাংসই অ্যাফেক্টেড। আপনি চবম অবস্থাব জন্যে মনকে তৈবি বাখুন।

ডাক্তাবেব মুখচোখেব ভাব দেখে অপর্ণা সবই বুঝলেন। সরে গেলেন খোকনের কাছ থেকে। পাশেব ঘবে গিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ভোবেব দিকে সব শেষ। তুবাব গভীব নিশ্বাসের সঙ্গে সাবা দেহটা তুলে উঠল। যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল ঠোঁট। খোকন ফুরিয়ে গেল।

ব্যাপাব বুঝতে বেশ সময় নিল। খোকনেব তু পাশে বিজয়বাবু আব অপর্ণা। নিষ্ঠুব সত্যটা কেউই প্রথমে উচ্চাবণ কবতে সাহস কবলেন না। তুজনে তুজনের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে বইলেন।

খোকন নেই—এ কথা বিশ্বাস করতে বিজয়বাবুর বেশ সময় লাগল। তবু বাঁচোয়া। বেশীব ভাগ সময় অফিসে কাটে। বাড়িতে থাকতে হলে পাগল হয়ে যেতেন। কিন্তু অপর্ণার অবস্থা

কাহিল। আলনায় খোকনের জামা প্যাণ্ট, তাকের ওপর তার বই খাতা স্লেট, সিঁড়ির নীচে ছড়ানো সংসার। সব ঠিক তেমনই আছে, শুধু মানুষটা নেই। ধারে কাছে আর কোন দিন তাকে দেখা যাবে না।

বাড়িতে পা দিয়েই বিজয়বাবু থমকে দাঁড়ান। মেয়েরা আর ছুটে নালিশ করতে আসে না, পথের মাঝখানে কাত হয়ে পড়ে থাকে না টুল, খবরের কাগজ জায়গা বদল করে না। সব যেন বড্ড ফিটফাট, সুবিন্যস্ত। অগোছাল করার মানুষটা নিঃশব্দে সরে গেছে।

বাতাসে চেয়ারের ঢাকা উড়ে পড়লে বিজয়বাবু চমকে ওঠেন। না, কেউ কচি হাত দিয়ে টেনে ফেলে নি, দমকা বাতাসে উড়ে পড়েছে ঢাকাটা। বাইরে কোথাও বেড়াল ডাকলে বিজয়বাবু জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ান। ল্যাম্প পোস্টের তলায় অসহায় এক বেড়ালের বাচ্চা আর্তনাদ করে চলেছে, তাকে আশ্রয় দেবার মতন আর কেউ নেই। নোংরা, কাদামাখা বেড়ালকে বুকে বয়ে আনার মত কোন শক্তি আর এগিয়ে আসবে না।

মাসের পর মাস গেল। শোকের প্রকোপ অনেকটা কম। বিজয়বাবু বাড়ি ঝাড় পোঁছ করতে করতে সিঁড়ির নিচে এসে দাঁড়ালেন। অপর্ণার দিকে চেয়ে বললেন, এ জায়গাটা বড় নোংরা হয়ে রয়েছে। এগুলো বাইরে বের করে দিলেই হয়।

অপর্ণা তরকারি কুটছিলেন, বঁটিটা কাত করে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

গোটা কয়েক খোলামকুচি, একটা নারকোলের মালা, খান দুই টিনের ঢাকনি। একজনের অসম্পূর্ণ একটা সংসার। এই কটা তো জিনিস! বৃহত্তর সংসারের কতটুকু আর জুড়ে রয়েছে! তাছাড়া সব ফাঁকা হয়ে গেলে বাড়ির লোক বাঁচবে কি করে!

বিজয়বাবু কথাটা আর একবার বলতে গিয়েই অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। অপর্ণার দুটো চোখ জলে ভরে উঠেছে।

এগিয়ে এসে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে গিয়ে বাধা পেলেন। কে সদর দরজার কড়া নাড়ছে। পড়শীরা কেউ কিংবা হয়তো অফিসের বন্ধুবান্ধব।

দরজা খুলেই বিজয়বাবু পিছিয়ে এলেন, কি খবর, এ সময়ে?

আরফান আলি সেলাম করে এক গাল হাসল। মুখে বলল, ঠিক সময়ে তো এসেছি বাবুসাব। বছর বছর এই সময়েই তো কলি ফেরানো হয়।

দু-এক মিনিট বিজয়বাবু কি ভাবলেন। হিসাব করলেন মনে মনে। তারপর বললেন, বেশ, তা হলে এক কাজ কর। পরশু থেকে আরম্ভ করে দাও। দু দিন আমার ছুটি আছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পারব।

তা আরফান খুব জানে। ছুটি না থাকলেও বাবু ছুটি নেবেন সে সময়ে। মজুরদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। দরকার হলে নিজেই ভারায় উঠে পড়বেন। তাদের হাত থেকে ব্রাশ নিয়ে সন্তর্পণে দেওয়ালের গায়ে বুলোবেন। কোথাও একটু দাগ না থাকে, সরু চুলের মতন কোন আঁচড়। দরজার ফাঁকে, ফোটোর পিছনে, আলমারির তলায় কোথাও না বাদ পড়ে যায়।

আরফান হাসে। বলে, এ বাড়িতে আমাদের একটি পয়সা লাভ থাকে না বাবুসাব। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেভাবে খাটিয়ে নেন, হাঁফ ছাড়বার ফুরসৎ পাই না।

বিজয়বাবুও বলেন, সঙ্গে সঙ্গে থাকি বলেই কাজটা এমন চমৎকার হয়। দেখ তো, বাড়ির দেওয়াল যেন হাসছে। কোথাও একটি দাগ আছে?

তাই ঠিক হল। সকাল থেকে মজুররা কাজে লাগল, স্নান

খাওয়া ভুলে বিজয়বাবু রইলেন সঙ্গে। ঘুরে ঘুরে তদারক করতে লাগলেন।

ওরে আরফান, এখানটা আর-এক বার বুলিয়ে দে বাবা, কিসের একটা কালো দাগ যেন রয়েছে।

এখানটা আর দুবার ব্রাশ চালা। ধোঁয়ায় কালচে হয়ে গেছে।

এই জায়গাটা একটু চেঁছে নে আরফান, তারপর চুন দিবি। দেয়ালে কে ছারপোকা টিপে মেরেছে!

আরফান হাসি থামাল না। ব্রাশ চালাতে চালাতে বলল, দেখুন না বাবুসাব, দেয়াল একেবারে নতুন করে দিয়ে যাব। বলেন তো দেয়াল চেঁছে আবার পলেস্তারা লাগিয়ে দিই।

অন্য সব ঘরের কাজ শেষ। এবার মজুররা বাইরের ঘরে চুনকাম শুরু করল। এ ঘরের ওপর বিজয়বাবুর সব চেয়ে কড়া নজর। একটু কোথাও যেন ছিটেফোঁটা দাগ না থাকে। বাইরের পাঁচজন এ ঘরেই এসে বসে। নিজেও বেশীক্ষণ এই ঘরেই থাকেন।

ছোট একটা টুল নিয়ে বিজয়বাবু বসলেন। হাতে খবরের কাগজ, চোখ কিন্তু মজুরদের দিকে। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন তাদের পাশে, নির্দেশ দিয়ে আবার ফিরে এসে বসলেন টুলে। চেয়ার, টেবিল, বইয়ের র‍্যাক সব সরিয়ে মাঝখানে জড়ো করা হয়েছে। কাজ চলছে পুরো দমে।

প্রথমে নজরে পড়ল আরফানের। টেবিলের পাশে উঁকি দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, ইস, এখানে দু কোটিংয়েও হবে না। সাদেক, চুনের বালতিটা এদিকে নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি।

কথাটা কানে যেতেই বিজয়বাবু কাগজ ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, কি হল, খুব ময়লা হয়েছে বুঝি?

শুধু ময়লা, দেওয়ালের দফা শেষ। আরফান আলি আঙুল দিয়ে দেখাল।

নিচু হয়ে দেখেই বিজয়বাবু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মাথাটা একটু ঘুরে উঠল। চোখের সামনে আবছা অন্ধকার। টেবিলের কোণ ধরে টাল সামলালেন।

ঠিক বলেছে আরফান। দেয়ালের দফা শেষ। কয়লা দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা। অ, ই আর ক। এই তিনটে বর্ণই যেন তার বেশী প্রিয়। এতদিন টেবিল ঢাকা ছিল বলে চোখে পড়ে নি।

চুনের বালতি এল। আরফান ব্রাশ ডুবিয়ে দেয়ালের সামনে গিয়ে বসল। বিজয়বাবুর দিকে ফিরে বলল, ব্রাশ বুলিয়ে দেখি বাবু। না ওঠে তো একটু চেঁছে নিতে হবে। কয়লার আঁচড় কি-না, চট করে উঠানো মুশকিল।

ব্রাশ বোলাবার মুখেই আরফান বাধা পেল। বিজয়বাবু তার হাত চেপে ধরলেন।

না, না, থাক্।

কি থাকবে? আরফান অবাক।

বিজয়বাবু বেশী কিছু বলতে পারলেন না। টেবিলটা সরিয়ে লেখাটা আড়াল করতে করতে বললেন, না থাক্, ওখানে চুন বোলাবার দরকার নেই। অমনিই থাক্।

সত্যিই, ওখানে চুন বোলাবার প্রয়োজন নেই। ও আঁচড় মানুষজনের চোখে পড়বে না। শুধু দরকার হলে টেবিল সরিয়ে বিজয়বাবু প্রাণভরে দেখতে পারবেন। নতুন করে দেওয়ালের কোথাও যখন আর কোন দিন আঁচড় পড়বে না, তখন এটুকুর দাম যে কত তা বিজয়বাবু কি করে বোঝাবেন আরফান আলিকে?

॥ পেশা ॥

দোষ বিভাসের নিজের, এখন আর কপাল চাপড়ালে কী হবে। তখন সকলে বেঁকে দাঁড়িয়েছিল, আত্মীয়-স্বজন সবাই। কিছু পরিমাণে বন্ধুবান্ধবও। কিন্তু বিভাসের এক গোঁ। বিয়ে যদি করতেই হয় তো সুরমাকে। রূপ! রূপ মানুষের কদিনের? যৌবনও তো পদ্মপাতায় জল। যা থাকে তা মানুষের মন। সেই মনের পরিচয় বিভাস পেয়েছে। একদিনে নয়, বছর দুয়েক সুরমার পাশাপাশি বসে।

যোগাযোগটা অদ্ভুতই। হিন্দি ক্লাস। অফিস থেকে পরোয়ানা বেরোল—উন্নতি করতে হলে হিন্দি ভাষাটা বপ্ত কবতেই হবে। দস্তুরমতন রপ্ত। রিকশাওয়ালা আব মুচিব সঙ্গে তিন্দিতে দরদস্তুব করতে পারলেই চলবে না, পবীক্ষায় পাশ কবতে হবে। দবকাব হলে চিঠিপত্র লিখতে হবে ওই ভাষায়, শক্ত ইংবেজীব তর্জমাও করতে হবে। খুঁজে পেতে বিভাস এক হিন্দি ক্লাসে গিয়ে বসল, আর বসল একেবারে সুরমার পাশে।

সুরমার অবস্থাও তথৈবচ। সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। ওপর থেকে হুমকি এল হিন্দিটা শিখে ফেলতে হবে। শিখতে পারলে আখেরে ভাল হবে। হিন্দি সার্টিফিকেটের পালে ভর দিয়ে তরতর করে বেয়ে যাবে প্রমোশনের পানসী। এফিসিয়েন্সী বারের চড়ায় আটকাবার ভয় থাকবে না।

পাশাপাশি বসল বটে কিন্তু পরীক্ষায় সুরমার ধারে কাছে বিভাস ঘেঁষতে পারল না। সুরমার নাম সব চেয়ে আগে আর বিভাসের নাম তলার দিকে।

ছ বছরের ব্যাপার। এবার বিভাস কোমর বেঁধে লাগল। যেমন করে হোক সুরমাকে ডিঙিয়ে যেতেই হবে। নইলে মান থাকবে না। কিন্তু ওই কোমর বাঁধাই সার। বইয়ের গোছা নিয়ে বসতেই পারল না। সময়ই বা কোথায়। সারাটা দিন অফিসে কাটে। বিকেলের দিকে ফুটবলের মরসুমে ক্লাসে আসাই দায়। তার ওপর সপ্তাহে দুদিন সিনেমার হাঙামা আছে।

সুরমাই প্রথম কথাটা তুলল, কি করছেন ? মন দিয়ে পড়াশোনা করুন। এ মাসে তো দিন ছয়েক মাত্র ক্লাসে এসেছেন।

বিভাস মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকেছে, কি করি বলুন তো, একেবারে সময় পাচ্ছি না।

রাজকাযটা কি করছেন ? সময় পাচ্ছেন না বলছেন ?

মানে ইয়ে রাজকার্য কিছু নয়, ওই ফুটবল আর সিনেমার ব্যাপার রয়েছে।

কমিয়ে দিন, কমিয়ে দিন। পরীক্ষার পর ওসব করবেন। জীবনে উন্নতি করতে হলে অনেক কিছু ছাড়তে হয়, বুঝলেন ?

না বুঝলেও বিভাস ঘাড় নাড়ল। তারপর থেকে ঠিক আসতে লাগল ক্লাসে। সুরমার পাশেও বসল। বসল বটে তবে শিক্ষকের দিকে যত না মনোযোগ দিল, তার চেয়ে অনেক বেশী নজর দিল পার্শ্ববর্তিনীর দিকে।

ক্লাসের পরে সুরমার সঙ্গে বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে দেবার ছল করে সঙ্গে সঙ্গে রইল। শুধু পড়াশোনারই নয়, বাড়ির খবরও সংগ্রহ করল। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বাপ বেসরকারি অফিসের মাঝারী কেরানী। পাঁচটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সুরমাই বড়।

একদিন সুরমার অনুরোধে তাদের বাড়িতেও গেল। বাপের সঙ্গে আলাপ করল। মায়ের সামনে বসে সুরমার এগিয়ে দেওয়া চা আর নারকেলের সন্দেশও খেল। তারপরের দিনই কথাটা পাড়ল সুরমার কাছে। জনতাবহুল পথ থেকে সরে এক পার্কের

নির্জন কোণে নিজেকে নিবেদন করল। সুষমা প্রথমে মাথা হেঁট করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে বলল, বাবা মাকে কথাটা একবার জানাতে হবে। আমি পারব না, তুমি বল।

সুষমার মা বাপের দিক থেকে কোন আপত্তি তো উঠলই না, তাঁরা বরং আকাশের চাঁদই হাতে পেলেন। পাল্টা ঘর। ভাড়া বাড়ি কিন্তু তাদের মতন এমন পায়রার খোপ নয়। হাত-পা মেলবার জায়গা আছে। মা নেই, বুড়ো বাপ। তাঁর মাসান্তে পেন্‌শনটুকু আছে। ছেলে যা রোজগার করে যথেষ্ট।

ঝড় উঠল বিভাসের পরিবারে। মা নেই বটে কিন্তু জাঁদরেল মাসী আছেন। খবর পেয়ে বালী থেকে সোজা এসে দাঁড়ালেন বিভাসের মুখোমুখি। বন্ধুবান্ধবরাও তর্জন শুরু করল। কি এমন দেখল বিভাস ওই হাড়সর্বস্ব মেয়েটার মধ্যে! না রূপ, না স্বাস্থ্য। স্কুল মাষ্টারি করে করে মুখেও কেমন একটা কাঠিন্যের ছোঁয়াচ! বেত উঁচিয়ে থাকা ভাব।

বিভাস অটল। কারো কোন কথা শুনল না। নিজেই বিয়ের বাজার করতে আরম্ভ করল। কার্ড ছাপানো থেকে সামিয়ানা ভাড়া করা- সব। বুড়ো বাপ মনের দুঃখে কাশীবাসী হলেন।

প্রথম খিটিমিটি বাঁধল বিয়ের কিছুদিন পরেই। বিভাসই কথাটা তুলল, আমি বলি কি, মাষ্টারিটা এবার ছেড়ে দাও।

সুষমা চমকে উঠল, সে কি?

মানে বাড়ির বৌ এখন বাইরে বাইরে নাই বা ঘুরলে।

সর্বনাশ, মাথায় আঁচল টেনে চিকের আড়ালে বসে থাকবে এমন বৌ চেয়েছিলে নাকি?

কি যে চেয়েছিল বিভাস নিজেই জানে না। তবে বাড়ির বৌ রোজগার করতে বেরোবে এটাই কেমন দৃষ্টিকটূ। বিশেষ করে সে নিজে যখন অক্ষম নয়।

সুরমা হাসল, ও, তোমার পৌরুষে লাগছে? ওভাবে ভাবছ কেন? ভাব না দুজনের অর্থে আর সামর্থ্যে পরিপাটি সংসার গড়ে উঠবে। আজকাল একজনের মাইনেতে খুঁড়িয়ে চলতে হয়, ভালভাবে চলা যায় না।

বিভাস একবার শেষ চেষ্টা করল, আমরা তো দুটি মাত্র লোক।

চিরকালই বুঝি দুটি থাকব? আগে থেকে তৈরী থাকতে হবে না?

সুরমা দু চোখে যেন বিদ্যুৎ ছড়াল।

বিভাস থেমে গেল বটে কিন্তু মনের খুঁতখুঁতুনি গেল না।

বিয়ের পর ওই মাসখানেক, তারপর সুরমা ক্রমেই যেন দূরে সরে যেতে লাগল। কোন কোন বিকেলে বিভাস একটু তাড়াতাড়ি ফিরল অফিস থেকে, সুরমা ফেরবারও আগে। তারপর সুরমা ফিরতে বলল, নাও, জামাকাপড় পাল্টে। সুরমা হাত-ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে অবাকচোখে চাইল।

কি ব্যাপার?

মারাত্মক কিছু নয়, বিভাস হাসল, ভাল বই এসেছে এলিটে, চল ঘুরে আসি।

মাথা খারাপ, সুরমা ঘাড় নাড়ল, আজ হয় না। অন্য দিন বরং চেষ্টা করতে পারি।

কেন, হয় না কেন?

সন্ধ্যার দিকে যাকে পড়াই তার পরীক্ষা সামনে, এ-সময় কামাই করা উচিত হবে না।

আরে একটা দিন, কি আর হবে। কাল গিয়ে বলবে মাথা ধরেছিল।

কাল গিয়ে কি বলব সে কথা নয়, সুরমার গলা রীতিমত দৃঢ়, আজ না গেলে ছাত্রীর ক্ষতি হবে, তা আমি পারব না।

বিভাস আর কথা বাড়াল না। শার্টটা গায়ে চাপিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল। পার্কে পার্কে ঘুরল কিছুক্ষণ, সোজা গঙ্গার ধারে গিয়ে বসল। বাড়ি ফিরল দশটা নাগাদ।

একদিন নয়, যখনই কোথাও যাবার কথা বিভাস তোলে, সুরমার কিছু না কিছু কাজ থাকে। কোন না কোন ওজর। আজ স্কুলেব মিটিং, কাল সেক্রেটারীব বাড়ি যাওয়া, পরশু ইনস্পেক্ট্রেসের ঝামেলা। সব কাজ কর্ম চুকিয়ে রাতেও নিস্তার নেই। খাটে শুয়ে সুরমার হাত থেকে পান নিতে গিয়ে বিভাস হাতটাই আঁকড়ে ধরে, একটু বস না এখানে, গল্প করি।

গল্প! সুরমা আঁতকে উঠেছে, তবেই হয়েছে। আমার একগাদা খাতা দেখা বাকি। ছত্রিশখানা খাতা আজ রাতেই দেখা শেষ করতে হবে।

সুরমার কথাব সঙ্গে সঙ্গে বিভাস হাত ছেড়ে দিয়েছে। বাতির আলো হাত দিয়ে আড়াল কবে ঘুমোবার চেষ্টা করতে করতে দেখেছে টেবিলের ওপর সুরমা ঝুঁকে পড়েছে। সামনে খাতাব স্তূপ। হাতে লাল পেন্সিল। লাল পেন্সিলের আঁচড় শুধু সামনের খাতাগুলোর ওপরই পড়বে না, তার আঁচড়ে বিভাসেব সারা জীবনটাই বুঝি বরবাদ হয়ে যাবে।

ইদানিং বিভাস আর বেশিক্ষণ বাড়িতেও থাকে না। থাকাব উপায়ও নেই। বিকেলে ভেতবেব ঘরে গুটি দুয়েক ছাত্রী নিয়ে সুরমা পড়াতে বসে। সে ঘরে ঢোকার উপায় নেই। কোনবকমে তিন চুমুকে চা শেষ করে বিভাস পাড়ার ক্লাবে গিয়ে বসে। দাবা শেষ করে বাড়ি ফেরে সাড়ে দশটার আগে নয়। ঠিকে ঝি দরজা খুলে দেয়। কোণের দিকে ঢাকা খাবার খেয়ে যখন শুতে যায়, তখন সুরমা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তার পরিশ্রান্ত মুখেব দিকে চেয়ে মায়া হয় বিভাসের। তাকে জাগাতে ইচ্ছা হয় না।

সেদিন বাড়ি ফিরেই বিভাস অবাক। সুরমা রান্নাঘরেই রয়েছে। গাছ কোমর বেঁধে উনানে কি-একটা চাপিয়ে খুব মন দিয়ে তদারক করছে।

একি, বিভাস চৌকাঠ বরাবর এসে দাঁড়াল, সরস্বতী আজ অন্নপূর্ণার বেশে যে?

কপালেব ঘাম আঁচলে মুছে সুরমা এগিয়ে এসে ঢিপ করে একটা প্রণাম করল। হেসে বলল, যাও, ঠাট্টা করতে হবে না।

ওসব কি হচ্ছে? বিভাস চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে রান্নাঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

দোহাই তোমার, এখানে গোলমাল করো না। সব পুরে ঝুড়ে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। তার চেয়ে জামাকাপড় ছেড়ে বাইরে বস। কি হচ্ছে এখনি জানতে পারবে।

বিভাসের বিস্ময়ের অন্ত নেই। সুরমার এমন হাসিখুশি চেহারা বিভাস ইদানিং দেখেছে বলে মনে করতে পারল না।

বড় জোব আধ ঘণ্টা, তাবপবই সুরমা ঘরে ঢুকল। এক হাতে ধূমায়মান চায়ের কাপ, অন্য হাতে খাবারেব থালা।

কি ব্যাপাব বল তো? বিভাস হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিতে নিতে বলল।

কি আবাব ব্যাপার। ইচ্ছা হল তোমাকে নিজের হাতে খাবার কবে খাওয়াই।

তা না হয় হল, কিন্তু হঠাৎ প্রণামের ঘটা যে।

সুরমা চেয়াব টেনে বিভাসের মুখোমুখি বসল। একটু একটু কবে সব বলল। স্কুলে উন্নতি হয়েছে। পদ আব অর্থ দুই-ই বেড়েছে। একেবারে সহকারী হেডমিস্ট্রেস।

তাই নাকি? কথাটা বলল বটে কিন্তু মনে মনে বিভাস উৎসাহ বোধ করল না।

হেড মিস্ট্রেস ভুগছিলেন অনেকদিন ধরে, বয়সও হয়েছিল, এত-

দিন পরে রিটায়ার করার সুমতি হল। কাজেই আমরাও ধাপে ধাপে ওপরে উঠলাম।

বিভাস কিছু বলার আগেই সুরমা আবার শুরু করল, মাইনে যেমন বাড়ল কাজও তেমনি দুগুণ হল। বাড়তি আরো দুটো ক্লাস দেখতে হবে। মুশকিল!

চায়ের কাপ শেষ করে বিভাস রুমালে মুখ মুছল, তাহলে সকাল বিকেল অল্পক্ষণের জন্যও তবু তোমার দেখা পাচ্ছিলাম, এবার থেকে বোধ হয় তাও হবার নয়, কি বল?

সুরমা উত্তর দিল না। মুচকি হাসল।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়েছে এইভাবে বিভাস বলল, তাহলে এক কাজ করা যাক। তোমার এই প্রমোশন সেলিব্রেট করা যাক আজ সন্ধ্যায়। চল দুজনে বেরিয়ে পড়ি। সিনেমা দেখে হোটেলে খেয়ে তবে বাড়ি.ফিরব।

তোমার তো খালি ঐ এক চিন্তা, সুরমা মুখ বেঁকাল, আজ আমার নড়বার উপায় নেই।

কারণ?

নির্মলবাবু আসবেন।

নির্মলবাবু! বিভাসের দুচোখ কৌতূহলের ছিটে।

স্কুলের সেক্রেটারী, সুরমা নিচু গলায় বলল, তাঁকে আজ খেতে বলেছি এখানে। এই সব লোককে হাতে রাখা ভাল, কি বল?

বিভাস কিছু বলল না, দাঁড়িয়ে উঠে পাঞ্জাবিটা টেনে নিল।

এ কি, বেরোচ্ছ কোথায়?

ক্লাবে।

বা, নির্মলবাবু আসবেন যে?

নির্মলবাবুকে তোয়াজ করে আমার কোন লাভ নেই সুরমা। আমার প্রমোশনের লোক আলাদা।

সুরমাকে আর কথার অবসর না দিয়েই বিভাস পথে পা দিল।

সব উৎসাহ এক ফুঁয়ে যেন নিভে গেল। নিজের হাতে খাবার করার উদ্দেশ্য বিভাসকে খাওয়ানো নয়, নির্মলবাবুকে পরিতৃপ্ত করা। বিভাস শুধু নিমন্ত্রণ-বাড়ির বাইরে ভিড় করে দাঁড়ানো ভিক্ষুকদের একজন। ছিটোনো উচ্ছিষ্টের অধিকারী। সব কিছু বিস্বাদ ঠেকল। শুধু খাবারগুলোই নয়, নিজের বিবাহিত জীবনও।

বিভাসের অনুমানই ঠিক। সুরমার দেখা পাওয়াই ভার হয়ে উঠল। বিকেলের দিকে স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হয় বলে, বাড়ি না এসে সোজা চলে যায় ছাত্রীদের বাড়ি। ফেরে প্রায় রাত ন-টা। কোন কোন দিন আরো দেরিতে। শুয়ে শুয়ে বিভাস সাইকেল রিক্‌শার শব্দ পায়। ক্লান্ত সুরমা দিনের কাজ সেরে বাড়ি ফেরে। সকালে বিভাস বিছানা ছেড়ে ওঠার আগেই সুরমা বাড়ি ছাড়ে। গলির মোড়েই এক ছাত্রী। উপমন্ত্রীর মেয়ে। সকালের চা-জল-খাবারের পালা ওখানেই সেরে আসে।

সুরমা আর বিভাসের দেখা হয় ছুটির দিন। তাও সুরমাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভাস পায় না। পরীক্ষার খাতা, কিংবা ছাত্রীদের রচনা দেখার ঝামেলা থাকেই। ওরই মধ্যে কিছু সংসারের কথা হয়, কিছু রাগ-অনুরাগের।

বন্ধুদের কাছে অপ্রস্তুতের একশেষ। দু-এক বার আনাগোনা করেই তারা ব্যাপারটা বুঝে নেয়। কেউ কেউ মারাত্মক ঠাট্টাও করে, বিভাসবাবু, আপনার স্ত্রী রাতে ঘরে আসেন, না স্কুলেই বেঞ্চ জোড়া দিয়ে রাতটা কাটান্?

প্রথম প্রথম আঘাত পেত বিভাস। মনে মনে ঠিক করত হেস্তনেস্ত কিছু একটা করবে সুরমার সঙ্গে। মুখোমুখি বোঝাপড়া, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিত। এ কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে লাভ কি! কিছুটা কাদা তো বিভাসেরও গায়ে লাগবে। হাসা-হাসি করবে পড়শীরা। তার চেয়ে এইভাবেই চলুক। সুরমা

তো আর অবুঝ নয়। ঠিক একদিন সব বুঝে বিভাসের কাছে এসে দাঁড়াবে। ক্রমে ঘরসংসারের কথাও যেন কমে এল। সুরমার মুখে কেবল স্কুলের কথা, ছাত্রীদের খবর, মাঝে মাঝে সহ-শিক্ষিকাদেব আনকোরা সংবাদ।

খবরেব কাগজ আড়াল দিয়ে বিভাস আত্মবক্ষা কবত। প্রয়োজন বুঝে মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে উত্তব। তেমন তেমন বুঝলে চোখ বুজে কপট নিদ্রা।

কিন্তু বিপদ এল সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে। হঠাৎ অফিসেব বোর্ডে কড়া নোটিশ। বিভাগীয় পবীক্ষায় পাশ না কবতে পাবলে মাইনে বাড়া তো দূবেব কথা, চাকবিব শিকে ছিঁড়তে দেবি হবে না। জেনাবেল ম্যানেজাবেব কড়া হুকুম। সাদা কাগজেব নোটিশ। কিন্তু বিভাসের চোখে সবই হলদে ঠেকল। সর্ষেফুলেব বর্ণ।

শুধু বিভাসই নয়, আশপাশেব অনেক কেবানীই কাত হ'ল। স্কুল কলেজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশীব ভাগেবই লেখাপড়াব ইতি। বইপত্রেব সঙ্গে খোঁজখবব নেই। আবার নতুন কবে বসতে হবে বইখাতা খুলে। সাধারণ জ্ঞানেব বই, পাটিগণিত আব ইংবাজী রচনামালা। উঠতে বসতে জেনাবেল ম্যানেজাবেব বাপান্ত। তাঁব পিণ্ডদানেব ব্যবস্থা শুরু হ'ল।

কিন্তু নিরুপায়। ওরই মধ্যে ছুটির পব দু' একজন বইখাতা খুলে অফিসেই বসে গেল। বাড়িতে নানান ঝামেলা। তাছাড়া এ বয়সে ছেলেমেয়েদেব সামনে বসে হেলে দুলে পড়া মুখস্থ কবাবও প্রচুব অসুবিধা।

বিভাস সোজা বাড়ি চলে এল। একবার ভাবল মাঝপথে নেমে বইপত্র কিনে নেবে কিন্তু তাবপবই সুবমাব কথা মনে পড়ল। কি দরকাব বাড়তি খরচ কবে। সুবমাকে বললে ছাত্রীদের কাছ থেকে সে-ই বই জোগাড় কবে দেবে।

বরাত বিভাসের। দরজার গোড়াতেই মুখোমুখি দেখা। সুরমা বাইরে যাচ্ছিল, বিভাস ডেকে থামাল।

কি বল? আমাকে আবার এখনি সেক্রেটারীর বাড়ি যেতে হবে।

বড় মুশকিলে পড়েছি।

তোমার তো রোজ মুশকিল। সুরমা দু পা এগিয়ে দাঁড়াল।

অফিসে পরীক্ষার নোটিশ দিয়েছে।

কিসের নোটিশ? সুরমা শুধু ঘুরেই দাঁড়াল না, বিভাসের সামনাসামনি চলে এল।

পরীক্ষার। কেরানীদের সবাইকে পরীক্ষা দিতে হবে। সাধারণ জ্ঞান অঙ্ক শ্রুতিলিখন আরো সব ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার।

পরীক্ষা। ভালই তো। পরীক্ষা না হ'লে যোগ্য ব্যক্তি চেনা যাবে কেমন করে? খুব ভাল ব্যবস্থা বলতে হবে। এতদিনে তোমাদের অফিসের কর্তাদের বুদ্ধি খুলেছে।

দু' এক মিনিট বিভাস চুপচাপ দাঁড়াল। একটি কথাও না ব'লে। ওর দুঃখ সুরমা বুঝবে না। এ বয়সে বইখাতা নিয়ে আবার শুরু করার যে কি জ্বালা তা সুরমাকে বলাই বৃথা।

একটা কাজ করতে হবে তোমাকে!

কি? সুরমার গলার স্বর বেশ খাদে। শরীরের কাঠিন্যভাবও কম।

কিছু বই যোগাড় করতে হবে। মিছামিছি পয়সা খরচ করে আর বই কিনতে ইচ্ছা করছে না, তার চেয়ে তুমি তোমার ছাত্রীদের কাছ থেকে বরং যোগাড়যন্ত্র করে দাও।

অঙ্ক, সহজজ্ঞান আর শ্রুতিলিখন, এই তো। আঙুল গুনে গুনে সুরমা হিসাব করল।

ব্যাটাদের কাণ্ড কিছু বলা যায় না, রচনা লিখতেও দিতে পারে। দেশভ্রমণের উপকারিতা কিংবা বৈদিকযুগে নারীপ্রগতি।

ঠিক আছে, বই আমি যোগাড় করে আনব, কিন্তু পড়বে তো মন দিয়ে, না সেই হিন্দি ক্লাসের মতন করবে ? সুরমার চোখে সন্দেহের ঝিলিক।

আরে না, না, সে ছিল অনেকটা শখের পড়া আর এতে একেবারে ভাতের হাঁড়িতে টান পড়বে যে। পাশ না করতে পারলে এফিশিয়েন্সির বেড়ায় আজন্ম মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে।

বিভাসের কথা শেষ হবার আগেই সুরমা রাস্তা পার হয়ে গেল।

সুরমা আটটার মধ্যেই ফিরে এল। সকাল সকাল খাওয়া শেষ করে বিভাস সবে বিছানায় গা এলিয়েছে, খুটখাট শব্দে চমকে চোখ ফিরিয়ে দেখল দু হাতে বইয়ের গোছা, সুরমা খাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

ব্যাপারটা আঁচ করতে বিভাসের মোটেই দেরি হল না। বালিশ আঁকড়ে চোখ বুজিয়ে ফেলল।

কিগো সাত তাড়াতাড়ি বিছানায় ঢুকলে যে ? বিভাস নির্বাক।

আটটা না বাজতে বাজতেই ঘুম, না মটকা মেরে পড়ে আছো ?

কথার সঙ্গে সঙ্গে সজোরে ধাক্কা।

ঘুম ভেঙে গেছে এমনি ভাব করে বিভাস উঠে বসল, কি হল ?

হবে আবার কি ?. নাও, উঠে চোখ মুখ ধুয়ে এস। আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে আসছি।

শরীরটা একটু যেন ম্যাজ ম্যাজ করছে। বিভাস শেষ চেষ্টা করল।

ও কিছু নয়। তোমাকে তো ভাল করেই চিনি, পড়ার নামে তোমার কত কি হত। হিন্দি ক্লাসের সব ব্যাপারই মনে আছে।

সুরমা আর দাঁড়াল না। হন্ হন্ করে রান্নাঘরের দিকে পা চালাল।

মিনিট দশেক, তার মধ্যেই খাওয়া শেষ করে সুরমা ফিরে এল। বিভাস বালিশে হেলান দিয়ে ঝিমোচ্ছিল, সুরমার ঝাঁকানিতে সোজা হয়ে বসল।

নাও, উঠে বস। শুয়ে শুয়ে পড়া হয় না।

অগত্যা বিভাসকে উঠতে হল। বসতেও হল বইয়ের গোছা সামনে নিয়ে। প্রথমে শ্রুতিলিখন। খবরের কাগজ থেকে কোন এক রাজনৈতিক নেতার জ্বালাময়ী বক্তৃতার অংশ সুরমা মেলট্রেনের গতিতে পড়ে গেল, তাই বিভাসকে লিখতে হল কোনরকমে। তারপর গোটা দশেক অঙ্ক, শেষকালে এক রচনার অবতারণা হতেই বিভাস হাতজোড় করল, দোহাই তোমার, আজ আর নয়। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। প্রথম দিনেই এতটা সহ্য হবে না।

সুরমা আড়চোখে একবার ঘড়ির দিকে দেখল। প্রায় এগারোটা। মুখে বলল আচ্ছা, ঠিক আছে, আজকের মতন এই অবধি। কাল তোমায় এক কাজ করতে হবে।

বল ?

এর আগে যদি অফিসে এ ধরনের পরীক্ষা হয়ে থাকে তো তার প্রশ্নপত্র যোগাড় করে আনতে হবে।

এর আগে পরীক্ষা, বিভাস ভাবতে শুরু করল, আমরা ঢুকবার আগে শুনেছি এ ধরনের পরীক্ষা বার দুয়েক হয়েছে।

ঠিক আছে, সেইসব প্রশ্নপত্র টুকে এনো কালকে, তাতে পড়াবার সুবিধে হবে। কি ধরনের প্রশ্ন আসে তাও আন্দাজ করা যাবে আর পরীক্ষকদের মনস্তত্ত্বটাও বুঝতে পারব।

বিভাস আর কথা বাড়াল না। বইয়ের গোছা সরিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিল।

সুরমা কিন্তু তখনি শুল না। বসে বসে সহজ জ্ঞানের বইটা পড়তে লাগল। বিভাসের জন্যই বইটা এক ছাত্রীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে।

পরের দিন বাড়িতে ঢুকতেই সুরমা তাগিদ দিল, কই, এনেছ প্রশ্নপত্র ?

ওই যাঃ, বিভাস চোখে মুখে আফসোসের আঁচড় কাটল, একেবারে মনে নেই। অফিসে পাঁচ কাজের ঝামেলা।

তোমার যে মনে থাকবে না, তা আমি জানি, সুরমা চিবিয়ে চিবিয়ে প্রত্যেকটি কথা উচ্চারণ করল, এ তো আর ফুটবল ম্যাচ কিংবা সিনেমা দেখা নয়, যে সব ভুলে অফিসই পালাবে দরকার হ'লে।

পাশ কাটাতে কাটাতে বিভাস শুনল, সুরমা বলছে, ব্যাপার আমি আগে থেকেই আঁচ করে রেবাকে দিয়ে প্রশ্নপত্র আনিয়ে রেখেছি। এই নাও।

রেবাকে দিয়ে ? বিভাস জামা খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ, রেবা আমাদের সঙ্গে পড়ায়। তার স্বামীর অফিসে বছর বছর পরীক্ষা হয়, তাকে বলে এগুলো চেয়ে এনেছি। অফিসের পরীক্ষা যখন, তখন কিছুটা একই ধরনের প্রশ্ন হবে। তুমি এক কাজ কর, চা-টা খেয়ে এইগুলোর উত্তর লিখে রাখ। গোটা ছয়েক অঙ্ক, একটা রচনা আর এই অনুবাদটা। আমি পড়িয়ে এসে দেখব।

কিন্তু, বিভাস একবার শেষ চেষ্টা করল, আজ ক্লাবে আমার ফাইন্যাল খেলা আছে যে। তালপুকুর স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে—

থাম, থাম, সুরমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, ওই করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছ। ভবিষ্যৎ খতম করছ। এসব নেশা ছেড়ে দিয়ে রোজ নিয়ম করে বই নিয়ে বসো দিকিনি। পরীক্ষা কবে তোমার ?

নিস্তেজ গলায় বিভাস বলল, এখনও প্রায় চার মাস আছে।

তবে, প্রায় এসে গেছে বল। চার মাস আবার সময়। নাও, আর কথা বাড়িও না। আজ আমি তাড়াতাড়ি ফিরব। ঘুমের

ভান করে বিছানায় পড়ে থেকো না যেন। তাহলেও অবশ্য লাভ হবে না, ঠিক টেনে তুলবো।

সুরমা বেরিয়ে গেল। বিকেলের জলখাবার খেয়ে বিভাস প্রশ্নপত্রের সামনে ঝুঁকে পড়ল।

অঙ্কগুলোর দিকে চোখ বুলিয়েই বিভাসের মাথা ঘুরে গেল। কোথায় কোন বাঁশের কিছু অংশ জলে, কিছু মাটিতে আর কিছু ঝড়ে ভেঙে গিয়েও বাকি ছ ফুট বাইরে রয়েছে, সেই বাঁশের পূর্ণ দৈর্ঘ্য কড়ি গুণে বিভাসকে বের করতে হবে। বাঁশ যে কত মারাত্মক হতে পারে তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। বারকয়েক চেষ্টা করে বিভাস বাঁশ সরিয়ে রাখল। তার পরের অঙ্ক আরোও জবরদস্ত। বাপ আর ছেলের বয়সের বর্তমান যোগফল পঞ্চাশ বছর, বছর দশেক আগে বাপের বয়স বুঝি ছেলের চতুর্গুণ ছিল। হিসাব করে বাপ আর ছেলের বয়স বের করতে হবে। প্রায় পুরো একটা পাতা নষ্ট করেও সমস্যার সমাধান হল না। বাপ আর ছেলের অদ্ভুত সব বয়স বেরোতে আরম্ভ করল। এক সময়ে ছেলের বয়স বাপের চেয়ে প্রায় তিন বছর বেশী হয়ে যেতে বিভাস ভয় পেয়ে থেমে গেল। কোন মানে হয় না এমন সব অঙ্ক কষার। কুষ্ঠীকুলুজী নিয়ে যাদের কারবার, তারা এই সব করে সময় নষ্ট করুক।

বিরক্ত হয়ে বিভাস অনুবাদের দিকে মনোযোগ দিল। একই অবস্থা। সুরমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য থেকেই একটা অনুচ্ছেদ তুলে দিয়েছে। সত্ত্ব-রজ-তম'র ছড়াছড়ি। ঐহিক সুখ-শান্তি ছেড়ে পারলৌকিক প্রশান্তির দিকে নজর দেবার নির্দেশ। খাস ইংরেজও বোধ হয় এসব শব্দের ইংরাজী জানে না।

বিভাস হাল ছেড়ে দিল। এ হবার নয়। বালিশে হেলান দিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

তন্দ্রা ভাঙল সুরমার চিৎকারে।

বা চমৎকার। তুমি যা পরীক্ষা দেবে বোঝাই যাচ্ছে।

বিভাস ধড়মড় করে উঠেই প্রথমে চোখ ফেরাল টেবিলের ওপর রাখা ঘড়িটার দিকে। আটটা বাজতে পনেরো। আশ্চর্য কাণ্ড, এর মধ্যে সুরমা ফিরে এল টিউশনি থেকে?

তুমি এর মধ্যে ফিরলে?

ফিরে বড় অসুবিধা করেছি তোমার, না? কাঁচা ঘুমটা ভেঙে দিয়েছি?

এতক্ষণে বিভাসের পৌরুষে আঘাত লাগল। এভাবে বার বার লেখাপড়ার খোঁটা দিলে কার সহ্য হয়!

কি বলছ তার ঠিক নেই। পড়ালেখার কাজ করে তবে শুয়েছি।

কোন কথা না বলে সুরমা চেয়ারে বসে খাতা ওল্টাতে লাগল। একটু পরেই আবার চিৎকার, কই একটা অঙ্কও তো কর নি।

অত শক্ত অঙ্ক আমাদের আসবে না।

ও, কি আসবে না-আসবে তাও তোমার জানা? তাহলে আর কষ্ট করে পড়তে বসা কেন, একেবারেই তো পরীক্ষা দিলে পার।

বিভাস কোন উত্তর দিল না। বোবার শত্রু নেই। কথায় কথা বাড়ে।

একি, রচনাও তো কর নি? কি করছিলে এতক্ষণ?

বিভাস মরিয়া। উঠে বসে বলল, রচনা করবার সময় পেলাম কোথায়? তোমার ওই অনুবাদ নিয়েই তো নাজেহাল। তুমি কি ভেবেছ আমি বেদান্ততীর্থ হবার পরীক্ষা দিচ্ছি?

সুরমা মুখে কোন কথা বলল না, বিছানার কাছে এসে বিভাসের হাত ধরে টেনে তুলল। বিভাস উঠে বসতে বলল, তোমার মনের কথাটা স্পষ্ট করে বল দিকি নি আমাকে। পরীক্ষা

দেবার মতলব নেই নাকি? তোমার জন্য আমি বিকেলের টিউশনিটা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে এলাম।

টিউশনি ছেড়ে দিয়ে এলে?

না ছেড়ে আর উপায় কি। আমি ফেরার আগেই তো তুমি নাক ডাকাবে। বইপত্র ছোঁবে না পর্যন্ত। ছি, ছি, ছি, তোমাকেও কি স্কুলের মেয়েদের মতন ধমক দিয়ে পড়াতে হবে?

এরপর সুরমা এক আশ্চর্য কাণ্ড করল। বিছানায় বিভাসের পাশে বসে আঁচল দিয়ে বিভাসের কপালের ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, লক্ষ্মীটি উঠে বস। এস, দুজনে মিলে অঙ্কটা কষে নিই। এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে তুমিই তো বলেছ অফিসে তোমার উন্নতি হবে, মাইনে বাড়বে, তাই না।

বিভাসের অবস্থা কাহিল। সুরমা চেঁচামেচি করলে তার উত্তর ছিল। সেও রুখে রুখে প্রতিবাদ করতে পারত। কিন্তু সুরমা খাদে নামিয়ে ফেলেছে স্বর, আদর যত্নে ভুলিয়ে দিচ্ছে বিভাসকে। ঘাড় নিচু করে সুরমার কথা শোনা ছাড়া বিভাসের আর কোন পথ নেই।

প্রথম প্রথম বিভাস ভেবেছিল কথাটা সত্যি নয়। বিভাসকে ভয় দেখাবার জন্য সুরমা বুঝি টিউশনি ছাড়ার হুমকি দিয়েছিল, কিন্তু পর পর পাঁচদিনের ব্যাপার দেখে বিভাসের হুঁশ হল। রোজ বিকেলে বিভাস বাড়ি ফেরার আগেই সুরমা বই সাজিয়ে অপেক্ষা করে। স্কুল থেকেও বোধ হয় একটু তাড়াতাড়িই আসে। শেষদিকের ক্লাসটা আর কারো সঙ্গে বদল করে নিয়েছে।

জলখাবারেরও ভোল পালটেছে। গরম লুচি, ঘি জবজবে, চায়ের বদলে ঘন দুধ। গোয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে সুরমা নিজে তদ্বির তদারক করে যোগাড় করে।

এ নিয়ে বিভাস বলেওছে দিনকতক।

কি, আবার আমাকে যে একেবারে দুগ্ধপোষ্য করে তুললে ?

কথাটা বুঝেও সুরমা গায়ে মাখে নি। ভ্রূ কুঁচকে উত্তর দিয়েছে, চায়ে কোন পদার্থ আছে নাকি ? মাথার কাজ যাদের করতে হয়, তাদের একটু করে দুধ খাওয়াই ভাল।

সেই সঙ্গে আক্ষেপও করেছে, কতটুকু করে দুধই বা তোমায় দিতে পারছি।

এ পর্যন্ত অবশ্য ভালই। ভাল খাওয়া-দাওয়ার শখ বিভাসের চিরদিনের। কিন্তু তারপরের ব্যাপারে তার চোখে জল এসে পড়ে। সুরমার মুখোমুখি চেয়ারে বসতে হয়। প্রথমে শ্রুতি-লিখন, তারপর অঙ্ক, শেষদিকে কোন দিন অনুবাদ, কোন দিন শূন্যস্থান-পূরণ। সুরমা নিজের হাতে একটা রুটিনও করে দিয়েছে।

মাঝে মাঝে বিভাস ওর মধ্যে হাল্কা পরিহাস করার চেষ্টাও করে, আর শূন্যস্থান পূরণ করে কি করব, স্থান তোমাকে পাওয়ার পরে আর শূন্য রইলই বা কোথায়।

কিছুক্ষণ সুরমার বুঝতে একটু অসুবিধা হয়, বুঝতে পেরে কিন্তু ক্ষেপে ওঠে, তোমাদের অফিসে রসিকতার কোন পেপার নেই, তাহলে তাতে তুমি পুরো নম্বরই পেতে। নাও, খাতা পেন্সিল নাও।

মাস তিনেক এইভাবে চলল। লেখাপড়া বিভাসের যতটুকু এগোল তাতে খুব খুশী হল না সুরমা। নিতান্ত দায়সারা গোছের ব্যাপার। আজ মাথাধরা, কাল সর্দি, পরশু জ্বরভাব, নানারকম ওজর বিভাস বের করতে শুরু করল। কিন্তু সুরমাও ছাড়বার পাত্রী নয়। বিভাসের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে চুলের ভেতর হাত বোলাতে বোলাতে বলে, ঠিক আছে, আমি মাথা টিপে দিচ্ছি, তুমি মুখে মুখে 'ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হওয়া উচিত' সেই সম্বন্ধে একটা একটা পয়েন্ট বলে যাও দিকি।

বিভাস ওসবের ধার দিয়েও যায় না। মাথার যন্ত্রণায় ছটফট

করে। মাঝে মাঝে মুখ থেকে অদ্ভুত শব্দ বের করে। গোঙানির সগোত্র। অনেক কষ্টে বলে, একটু জোরে জোরে টিপে দাও। উঃ, কি যন্ত্রণা। কথার সঙ্গে সঙ্গে চোখদুটো বুজিয়ে ফেলে।

সুরমা মুশকিলে পড়ে যায়। এমন অবস্থায় রাষ্ট্রভাষা আরোপ করা যায় না, করা সমীচীনও নয়। চুপ করে বিভাসের মাথাটা কোলে নিয়ে বসে থাকে।

সেদিন অফিসে যেতেই খবর মিলল। ফাইল ডিপার্টমেণ্টের সত্যেনবাবু বিভাসের দুটো হাত জাপটে ধরল।

ভায়া সুখবর।

বিভাস চেয়ারে বসে পানের ডিবে থেকে পান বের করে মুখে দিচ্ছিল, সত্যেনবাবুর ব্যাপার দেখে অবাক, কি, হল কি? বুড়ো-বয়সে এমন লম্ফঝম্ফ আরম্ভ করলে?

আরে বুড়ো বলে অফিস আর রেহাই দিল কোথায়। বই খাতা সামনে রেখে তো স্কুলের পড়ুয়ার অধম করে তুলল।

সত্যেনবাবুর অবস্থা বিভাসের চেয়েও খারাপ। খুব অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছে। ঘরভর্তি ছেলেপুলে। বড় মেয়েটি প্রায় বিবাহ-যোগ্যা। পাত্রেব সন্ধান চলছে। বার বার তিন বারের চেষ্টায় সত্যেনবাবু কোনরকমে ম্যাট্রিকের বেড়া টপকেছে, তাও জখম হয়ে। কাজেই লেখাপড়ার ধার দিয়েও যায় না। সভয়ে খবরের কাগজও সরিয়ে রাখে। অফিসের পরীক্ষার নোটিশে রীতিমত ঘায়েল হয়েছিল। মনে মনে ঠিক করেছিল একসময়ে চুপি চুপি জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে সোজা শুয়ে পড়বে তাঁর পা বরাবর। তারকেশ্বরের হত্যা দেওয়ার ধরনে। পাথরের ঠাকুরের মন গলে আর এতো রক্তমাংসের মানুষ।

খবরটা কি শুনি?

পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেল।

বন্ধ ? বিভাস উৎসাহে লাফিয়ে উঠল, চেয়ারের ধাক্কায় কালির দোয়াত কাত। দু-একটা ফাইলও মেঝেয় ছিট্‌কে পড়ল।

অনেকটা ভাই, সত্যেনবাবু বোঝাবার চেষ্টা করল, কর্তারা নোটিশ দিচ্ছেন, ছ মাস অন্তর পরীক্ষা হবে। ফেল করলেও চাকরির শিকে ছেঁড়বার ভয় নেই। তিন বছরের মধ্যে পাশ করলেই হল।

বিভাস যেন নিভে গেল, এই সুখবর! চেয়ারে বসতে বসতে নিরুত্তাপ গলায় বলল, আমি ভাবলাম বুঝি আর দিতেই হবে না পরীক্ষা।

আরে ওই তো হল ভায়া। তিন বছব কি কম সময়। একটা রাজ্যের পতন ঘটে যায়, পুরোনো মানুষ সরে নতুন মানুষ আসে। এ নিয়মই হয়তো বদলে যাবে।

কিন্তু নোটিশ টাঙিয়েছে ? বিভাসের গলায় সন্দেহের ছোঁয়াচ।

আজ টাঙাবে। এ একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর। জেনারেল ম্যানেজারের স্টেনো মিস্টার পিল্লের কাছ থেকে শোনা। নোটিশ টাইপ হয়ে গেছে।

কথাটা সত্যি। দুপুর নাগাদ বোর্ডে নোটিশ আটকাল, সঙ্গে সঙ্গে সারা অফিস হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর। প্রায় সকলের মুখেই স্বস্তির আভাস। যে রাহু মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল, অন্তত কিছুদিনের জন্য তার প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি। এরই মধ্যে দু-এক জন ফোড়নও কাটল। বলল, এটা অন্যায়, যা হবার একেবারে হয়ে যাওয়াই ভাল। এ কুপিয়ে কাটার কোন মানে হয় না।

বিভাস একটি কথাও বলল না। সুরমা সঙ্গে একটা হালকা ইংরেজী বই দিয়েছিল, টিফিনের সময় গালগল্প না করে দু ছত্র অনুবাদ করার জন্য। অনুবাদটা কিছুতেই বিভাসের রপ্ত হচ্ছে না। বুঝিয়ে বুঝিয়ে সুরমা হয়রান। অন্তত সে বিপদ থেকে

আপাতত বাঁচোয়া। সহকর্মীদের চোখ বাঁচিয়ে বসে বসে ভাষান্তর করার চেষ্টা কি কম দুর্ভোগ!

সেদিন ইচ্ছা করেই বিভাস একটু দেরিতে বাড়ি ফিরল। মাথার ওপর থেকে যেন একটা বোঝা সরে গেছে। প্রায় বছর তিনেকের জন্য আপাতত নিশ্চিন্ত। সকাল-সন্ধ্যা সুরমার মুখোমুখি বসে জাবর কাটতে হবে না। ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেলের স্ত্রীর নাম কি অথবা পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজের ওজন ক' টন কিংবা রাডার বিমানের বিশেষত্ব কি ইত্যাদি সহজ-জ্ঞানের ফিরিস্তি আওড়াতে হবে না। হাত-পা মেলে আবার ক্লাবে ছুটতে পারবে, তাস কিংবা দাবার ছক সামনে রেখে দুনিয়া ভুলে যাওয়ার প্রয়াস।

সুরমার সঙ্গে দেখা হল বাড়ির চৌকাঠে। অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে বোধ হয় বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। বিভাসকে দেখে দুচোখ বিস্ফারিত করে বলল, বা, চমৎকার!

কি, চেহারাটা তো? অনেকেই বলে। বিভাস গলায় লঘু পরিহাসের সুর মেশাল।

বাজে বকো না। আজ বাদে কাল পরীক্ষা, মাঝ-রাতে আড্ডা দিয়ে ফিরতে লজ্জা করে না?

সত্যি কথাটা বলতে গিয়েই বিভাস থেমে গেল। শুধু বলল, মাথাটা বড্ড ধরেছে, তাই পার্কে বসেছিলাম এতক্ষণ।

সুরমার দুচোখে চিন্তার ছায়া, কি ব্যাপার বলতো, প্রায়ই তো তোমার মাথা ধরে। চোখ খারাপ হল না তো। একবার বরং ডাক্তারকে দেখাও।

বিভাস উপেক্ষার হাসি হাসল, ডাক্তারে কি করবে। তুমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

ও, বুঝেছি তোমার মতলব। হাত বুলিয়ে দিতে আমার

আপত্তি নেই, কিন্তু তারপরে উঠে লেখাপড়া করতে হবে। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, এখন তোমায় ফাঁকি দিতে দিচ্ছি না।

বিভাস চুপচাপ। মুখহাত ধুয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে সুরমার কোলে মাথা রেখে শুল। একটু একটু করে বললেই হবে। পরীক্ষার কোন তাড়া নেই, কাজেই পড়াতেও ইস্তফা।

বেশ কিছুক্ষণ পর বিভাস চোখ খুলল। এইবার ব্যাপারটা বলে ফেলাই ভাল। কিন্তু চোখ খুলেই অবাক। সুরমার দুচোখের দৃষ্টিতে মমতার ছোঁয়াচ। পরম যত্নে বিভাসের কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কোলের কাছে টেনে নিয়েছে তাকে। শিক্ষিকার কাঠিন্যের লেশমাত্র কোথাও নেই, অধ্যয়নসর্বস্ব কোন মেয়ের চেহারাই নয়।

বিভাস জানে আসল কথাটা শুনলেই সুরমার রূপ বদলে যাবে। কোল থেকে বিভাসের মাথাটা নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে উঠবে। ছেড়ে-দেওয়া টিউশনির খুঁট খুঁজে আবার শুরু করবে পুরোনো জীবন। সেক্রেটারী, ছাত্রী, সুহাসিনী-বালিকা বিদ্যালয়, সহ-শিক্ষিকা, 'একরাশ পরীক্ষার খাতা—এ সবের তলায় আজকের স্নেহ-প্রীতি-মমতা সব উধাও হয়ে যাবে। বিভাসও নিশ্চিহ্ন।

তার চেয়ে এই ভালো। পরীক্ষাই দেবে বিভাস, অন্তত দেবার ভান করবে। সারাজীবন ধরে সেই পরীক্ষার জন্য তৈরী করবে নিজেকে। অফিসের পরীক্ষা এড়াতে নিজেকে কঠিনতর পরীক্ষার সামনাসামনি আর দাঁড় করাবে না।

॥ তিন পুরুষ ॥

প্রতিকৃতি উন্মোচন করলেন এস. ডি. ও. সায়েব। মিনিট দশেক ধরে বক্তৃতাও করলেন। অবশ্য বলার কথা অফুরন্ত। সারা দেশের লোক এক ডাকে চেনে। ছেলে থেকে বুড়ো পর্যন্ত। বিপ্লবী যোগজীবন দত্ত। অগ্নিযুগের শহীদ। সারারাত ধরে লড়াই চলেছিল উড়িষ্যার জঙ্গলে। শেষকালে শেষ বারুদ নিজের ওপর খরচ করেছিলেন, তবু পুলিসের হাতে ধরা দেন নি।

এস. ডি. ও. সায়েবের পরেই আমার পালা। যোগজীবনবাবুর কর্মপন্থা কিছু কিছু জানা ছিল, পুরনো কাগজ দেখে জীবনীটা ঝালিয়ে নিয়েছিলাম। দধীচির সঙ্গে তাঁর তুলনা করে উদাত্ত গলায় মিনিট পনের বললাম। শুধু নিছক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নয়, এক সময়ে যোগজীবনবাবুর মত মানুষেরা আমাদের গভীর-ভাবে নাড়াও দিয়েছিলেন। মনে আছে তখন স্কুলের ছাত্র আমরা, অদম্য উৎসাহে খবরের কাগজের পাতায় বিপ্লবীদের সংবাদ সংগ্রহ করতাম, বিশেষ করে যোগজীবন দত্তের।

সভা শেষ করে বেরোবার মুখেই বাধা পেলাম। শীর্ণ লম্বাটে ধরনের চেহারা, ব্রণ-বিমণ্ডিত মুখ, চোয়াল ওঠা, অমাবস্যাকে হার-মানানো বর্ণ। কিন্তু দুটি চোখ অদ্ভুত উজ্জ্বল, আধ-অন্ধকারে জোনাকির মত জ্বলছে।

দু হাত বুকের ওপর জড়ো করে বলল, আলাপ করতে এলাম। আপনাদের মত লোকের এ গাঁয়ে পায়ের ধুলো পড়া যে—

হাত তুলে মাঝপথে থামিয়ে দিলাম।

কি বলছেন! কত বড় আত্মার জন্মভূমি এ গাঁ তা তো জানেন। এমন একজনের স্মৃতিসভায় আসতে পারা আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আপনার পরিচয়টা?

পাশে দাঁড়ানো একটি ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। আজ্ঞে, ইনি অমিয়জীবন দত্ত, যোগজীবনবাবুর নাতি।

বিস্মিত হলাম। আশা করেছিলাম যে, যোগজীবনবাবুর বংশধর আজকের সভার পুরোভাগে থাকবেন। মঞ্চের উপর আসন গ্রহণ করবেন। কিন্তু তাঁকে পাঁচমিশেলী ভিড়ের মধ্যে দেখব, তা ভাবি নি।

আপনি যোগজীবনবাবুর নাতি? সাগ্রহে তাঁর একটা হাত জড়িয়ে ধরলাম।

একেবারে সাক্ষাৎ তাঁর ছেলের ছেলে। ভদ্রলোক হাসলেন, তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, এখন তো ট্রেনের অনেক দেরি, চলুন গরিবের বাড়ি একটু বসে যাবেন।

যোগজীবনবাবুর নাতিকে না বলতে পারলাম না। পাশাপাশি চলতে শুরু করলাম।

একেবারে গ্রামের কোণ-ঘেঁষে পাকা দালান। পুকুর, বাগান —কিছুরই অভাব নেই। যোগজীবনবাবুর নাতি বেশ গুছিয়ে বসেছেন, তাঁর চেহারা দেখে বুঝতে পারি নি, কিন্তু বাড়ি আর জমি-জমা দেখে তাই মালুম হল।

দাওয়ায় মাদুর পেতে বসলাম। ঝিরঝিরে বাতাস, দক্ষিণের অবারিত দাক্ষিণ্য।

চা-খাবার খেতে খেতেই আলাপ চলল।

যোগজীবনবাবুর পুরনো দু-একটা ফটো দেখলাম। তাঁর পূজা করার কুশাসন, এমন কি কোশাকুশি পর্যন্ত। অনেক কাগজ-পত্র চিঠি ছিল, সেগুলো পাড়ার লাইব্রেরি থেকে লোক এসে নিয়ে গেছে।

যোগজীবনবাবুর পাশাপাশি আর-একটি ভদ্রলোকের ফটো দেখলাম।

অমিয়জীবন বলল, আমার বাবা।

আপনার বাবা? ইনি কি করতেন?

আমাদের যা জাতব্যবসা। অমিয়জীবন মুচকি মুচকি হাসল।

আপনাদের জাতব্যবসা? গলার স্বরে কৌতূহল মেশালাম।

হ্যাঁ, পুলিসের সঙ্গে বিরোধ। ঠাকুর্দা তো পুলিসের সঙ্গে লড়াই করতে করতেই প্রাণ দিয়েছেন তা তো জানেনই। বাবাও প্রায় তাই।

আপনার বাবাও বিপ্লবী ছিলেন?

কতকটা, তবে তিনি অন্য পথের। ঠাকুর্দা ছিলেন সন্ত্রাসবাদী। গুলিগোলা নিয়েই তাঁর কারবার ছিল, কিন্তু বাবা ছিলেন অহিংস-সংগ্রামী।

কি নাম ছিল তাঁর?

প্রবাসজীবন দত্ত। ডাণ্ডী-অভিযানে ছিলেন, লবণ সত্যাগ্রহেও। যেদিন যেদিন মহাত্মাজী অনশন পালন করতেন, সেসব দিন বাবাও উপবাস করতেন। মহাত্মাজীর এমন একনিষ্ঠ সাধক আর দেখি নি। বাবা মারাও গেছেন পুলিসের লাঠিতে।

পুলিসের লাঠিতে?

কথাটা বলে আবার ফটোর দিকে চোখ ফেরালাম। মোটা ধুতি হাঁটু পর্যন্ত, গায়ে ফতুয়া, শীর্ণ চেহারা, কোটরগত চোখ, কদমছাঁট চুল। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কিছু নয়। পুলিসের লাঠিতে অমরত্ব বরণ করে নিয়েছেন, অথচ আশ্চর্য এঁর নামও কেউ জানে না। বাপের খ্যাতির আওতায় চাপা পড়ে গেছেন, নিষ্প্রভ হয়ে গেছেন তাঁর যশের খর-জ্যোতিতে। তাছাড়া এদেশে এমন কত জীবন অখ্যাত অজ্ঞাতভাবে মুছে গেছে তার ঠিক আছে?

কোথায় মারা গিয়েছিলেন ?

পুনায়। খবর পেয়ে আমরা গিয়েছিলাম কিন্তু জীবন্ত দেখা হয় নি। সেখানেই কাজ শেষ করে ফিরে আসতে হল।

আপনার বাবার কোন জিনিস নেই আপনার কাছে ? তাঁর ব্যবহার করা কিছু ?

বিশেষ কিছু নেই। দাঁড়ান, দেখাচ্ছি আপনাকে।

অমিয়জীবন ভিতরে চলে গেল। চোখের সামনে সব-কিছু যেন নতুন রূপ নিল, এই বাড়ি, বাগান, পুকুর—সব। স্বদেশ-প্রেমিকের নিশ্বাসপূত এর বাতাস, তাঁদের পদরজধন্য এখানকার মাটি।

অমিয়জীবন ফিরে এল। হাতে একটা জীর্ণ গীতা আর একটা চশমা। অঞ্জলি পেতে তুটো জিনিস হাতে নিলাম। কপালে ঠেকালাম ভক্তিভরে।

হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এ তুটো জিনিস উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। সযত্নে রেখে দিয়েছি।

ততক্ষণে আমি গীতার পাতা ওলটাতে আরম্ভ করেছি। লাল পেন্সিলে লাইন টানা। মার্জিনে ছোট ছোট অক্ষরে হিজিবিজি আঁচড়, বোধ হয় মন্তব্য। চেষ্টা করেও একটি বর্ণ পড়তে পারলাম না।

লাইব্রেরির ছেলেরা বইটা চাইতে এসেছিল, আমি দিই নি। সবই যদি লোকদের দিয়ে দিই, তবে আমাদের কি থাকে বলুন ?

সত্যি কথা। মহাপুরুষদের এটাই ট্র্যাজেডি। দেশের লোক স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে উজাড় করে তাঁদের সব-কিছু নিয়ে যায়, বংশধরদের জন্য আর কিছু বিশেষ থাকে না।

উত্তর দিতে গিয়েই হাতঘড়ির দিকে নজর পড়ল। সর্বনাশ, ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে, এখান থেকে স্টেশনও খুব কাছে নয়।

উঠে দাঁড়ালাম। অমিয়জীবনের দিকে ফিরে বললাম, আজকের মত উঠি, এখন না বেরোলে ট্রেন ধরতে পারব না।

চলুন এগিয়ে দিই আপনাকে।

চটি পায়ে গলিয়ে অমিয়জীবন তৈরি হয়ে নিল।

সড়ক ছেড়ে বুনো পথ। টর্চ ধরে অমিয়জীবন পথ দেখাল। মিনিট পনেরর মধ্যে স্টেশনে পৌঁছে গেলাম।

এবার আপনি যান। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম।

কষ্ট? কি যে বলেন। অমিয়জীবন বিগলিত হবার ভান করল। আপনাদের মত লোকের সান্নিধ্য পাওয়া কম ভাগ্যের কথা।

জুৎসই কিছু বলবার আগেই ট্রেন এসে পড়ল। উঠে পড়লাম।

কামরায় বসে অমিয়জীবনের দুটো হাত চেপে ধরলাম।

বড় আনন্দ হল আপনার মত লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে। যদি সুযোগ-সুবিধা হয়, শহরে গেলে দেখা করতে ভুলবেন না।

সময় পেলে নিশ্চয় যাব। তবে নিজের এমন ঝঞ্ঝাটের কাজ—

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল। আশ্চর্য, ভদ্রলোকের সঙ্গে এতক্ষণ কাটালুম, অথচ কি পেশা তাই জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

আপনার কি করা হয়?

আমার? অমিয়জীবন অমায়িক হাসি ফোটাল মুখে। বলল, আমাদের যা জাতব্যবসা। তিনপুরুষ ধরে যা করে আসছি।

তার মানে? বিস্মিত হলাম।

পুলিসের সঙ্গে সংগ্রাম, আর কি।

ট্রেন চলতে শুরু করল। অমিয়জীবন হাঁটতে লাগল পাশ দিয়ে।

পুলিসের সঙ্গে সংগ্রাম! কিন্তু স্বাধীন দেশে পুলিসের সঙ্গে সংগ্রামের অর্থ!

বললাম কথাটা।

অমিয়জীবনের মুখের হাসি অম্লান।

দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নি।

লৌহদানবের যান্ত্রিক আর্তনাদ। অমিয়জীবন গলার আওয়াজ চড়াল।

আফিং আর চরসের সামান্য ব্যবসা আছে। পুলিশের উৎপাতে নির্বিঘ্নে কাজ চালানোই মুশকিল। তাই লুকিয়ে-চুরিয়ে কারবার চালাতে হয় চোখে ধুলো দিয়ে চোরা পথে। ঠাকুরদার মতের সঙ্গে আমার মিল নেই, আর তাতে বিপদও অনেক। আমি বাবার আদর্শে মানুষ। অহিংস সংগ্রামের পথই আমার পথ। হয়ত বাপ-ঠাকুরদার মতই মৃত্যু কপালে আছে।

ট্রেণের জোর শব্দে শেষের কথাগুলো কানে গেলো না। একরাশ কাল ধোঁয়ার আড়ালে মানুষটাও ঢাকা পড়ে গেল। বিপ্লবী সাধকের উত্তরসাধক অমিয়জীবন দত্ত।

॥ মোমবাতি ॥

গোলকবাবু হাই তুললেন, আড়চোখে দেয়ালে ঝোলানো ঘড়ির দিকে চাইলেন, তারপর আবার ঝুঁকে পড়লেন সামনের খাতার ওপর।

এখনো ছাব্বিশখানা খাতা বাকী। আজ রাত্রেই দেখা শেষ করে বেলা ন'টার মধ্যে হেড-একজামিনর মহীতোষবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

পড়তে পড়তে গোলকবাবুর ভ্রূ কুঁচকে গেল, হাতের লাল পেন্সিল দিয়ে আঁচড় কাটলেন খাতার ওপর। অস্ফুটোক্তি করলেন—না, কিছু লেখাপড়া করে না! কেবল সিনেমা আর আড্ডা। এই করলে কি আর পরীক্ষায় পাস করা যায়? নিজেদের মাতৃভাষা তাও শিখতে পারে না ভালো করে। বানান দেখলে চোখ ফেটে জল আসে, ব্যাকরণের বনিয়াদ একেবারে ঢিলে।

গোলকবাবু পাশে-রাখা একটা বিড়ি তুলে নিলেন। অনেক কসরত করে হ্যারিকেনের আলোয় বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে বার দুই সুখটান দিয়ে খাতার ওপর ঝুঁকলেন।

বেশ কিছুক্ষণ কাটল। অনেকগুলো খাতা দেখা শেষ। ওরই মধ্যে গোলকবাবু একবার উঠে ছেলেদের গায়ে ঢাকা দিয়ে এলেন। ধারে কাছে বোধ হয় কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। হু-হু করে জোলো হাওয়া আসছে জানালা দিয়ে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাবে। চিরদিনই গোলকবাবুকে এসব করতে হয়। স্ত্রী অন্নপূর্ণা একবার শুলেই চৈতন্য হারায়। গায়ের ওপর দিয়ে হাতি গেলেও সার থাকে না। ঝড়-বৃষ্টি তো তুচ্ছ।

ফিরে এসে বসতেই বিপত্তি। হ্যারিকেনটা প্রায় নিবু-নিবু হয়েই ছিল, হঠাৎ দপদপ করে উঠে একেবারে নিভে গেল।

জ্বালাতন! দাঁতে দাঁত চেপে গোলোকবাবু আক্ষেপ করলেন। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে হ্যারিকেনটা দুহাতে তুলে নিলেন। হ্যারিকেনের আর দোষ কি? এক ফোঁটা তেল নেই। অবশ্য এমন একটা ব্যাপারের ইঙ্গিত অন্নপূর্ণা শুতে যাবার আগেই করেছিল।

—হ্যারিকেন জ্বেলে তো বসলে, তেল আছে কি-না দেখেছ? সকালে দশ বার করে বলেছি বিকেলে ফেরার সময় তেল কিনে আনতে, তা কেমন মনে আছে!

কথাটা কিছু গোলোকবাবুর কানে গিয়েছিল, কিন্তু তখন খাতার পাতায় তন্ময়। শুধু কানেই গিয়েছিল, মরমে পৌঁছয় নি। এখন অবস্থা দেখে কপাল চাপড়ালেন। তারপরই মনে পড়ে গেল। জানলার তাকে একটা মোমবাতি রয়েছে। দিনকয়েক আগে কিনেছিলেন, এমনি তেলের টানাটানির সময়, তারপর ব্যবহার করতে হয় নি। পুরোটাই রয়েছে।

গোলোকবাবু মোমবাতি জ্বালালেন। খাতাটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে পেন্সিলটা বাগিয়ে ধরলেন।

আরো গোটা-তিনেক খাতা শেষ হল। তার পরের খাতাটার ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে গোলোকবাবু টান হয়ে বসলেন। খাতাটা তুলে ধরলেন চোখের সামনে।

হাতের লেখা দেখে মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু এসব কি লিখেছে! রচনার বিষয়—স্ত্রী-স্বাধীনতা কিংবা দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা। এ-দুটোর কোনটাই লেখে নি। অন্ততঃ আরম্ভ দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।

জীবনে বাড়ির চৌকাঠের বাইরে যে পা দেয় নি তার পক্ষে দেশ-ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লেখার চেষ্টা যে কতটা কষ্টসাধ্য তা

নিশ্চয় বুঝতে পারবেন। ইনিয়ে-বিনিয়ে পুরী-ভ্রমণ কিংবা কাশ্মীর-যাত্রা সম্বন্ধে হয়তো লিখতে পারি পাতা-তিন-চার, তাতে নম্বর কত পাবো জানি না, কিন্তু মন যে ভরবে না তা জানি। তাছাড়া যে জায়গা সম্বন্ধে কিছুই জানি না, সে সম্বন্ধে কল্পনা করারও অসুবিধা অনেক।

আর, স্ত্রী-স্বাধীনতা! এ দেশে ও-কথাটার কি মানে বলুন তো? অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েরা সিনেমায়, পার্টিতে, ক্লাবে ছুটোছুটি করে বাড়ির মোটরে আর মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা প্রাণের তাগিদে হাজার পুরুষের ভিড় ঠেলে প্রাণধারণের ক্লান্তিকর গ্লানির সন্ধানে সকাল থেকে সন্ধ্যা কাটায়—এই তো স্বাধীনতার স্বরূপ। কিন্তু এই কি স্বাধীনতার অর্থ?

যাক্, আজ যখন বলতে বসেছি, সব কথাই বলব। আমার কথা। আমার একমাত্র অনুরোধ দয়া করে একটু শুনুন। নাই দিলেন নম্বর, পাসফেলের মাপকাঠিতে নাই-বা করলেন বিচার। অল্পক্ষণের জন্য পরীক্ষকের নির্মোক খুলে ফেলে দরদী মানুষের চোখ দিয়ে আমাকে দেখুন।

জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই মাকে হারিয়েছি। অপয়া, অলুক্ষণে এমন একটা অপবাদ পেয়েছি চোখ মেলে পৃথিবীর আলো দেখবার আগেই। দুটি বড় ভাই। আজন্ম রুগ্ন বাপ। স্বল্পপরিসর দুখানি ঘর এই বিরাট মহানগরীর অখ্যাত এক সড়কে। এই আমার পৃথিবী। আমার জীবনের মাকুব টানাপোড়েন সীমিত এই আয়তনের মধ্যে, এই তিনটি মানুষকে নিয়ে। বাবা কোনো বে-সরকারী অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী। মাসের মধ্যে বেশির ভাগ দিনই বুকের যন্ত্রণায় শুয়ে শুয়ে কাতরাতেন বাড়িতে। কবে বাসের সঙ্গে এক মোটরের ধাক্কা লেগেছিল, সেই সময় বাবার বুকে চোট লাগে। সেই থেকে এই রকম বুকের যন্ত্রণা। চোখে দেখা যায় না!

বড়দা লেখাপড়া শেখার একটা চেষ্টা করেছিল। আপ্রাণ চেষ্টা। কলেজেও পড়েছিল দু-এক বছর, কিন্তু তার বেশী আর এগোতে পারে নি। সংসার অচল। বাবা ইতিমধ্যে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন, সম্বল তাঁর মাসান্তের পেন্সন আশীটি টাকা। তলা-ফুটো সংসারের পানসীর জল ছেঁচবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ছোড়দার লেখাপড়ার বালাই ছিল না। নিজের চেষ্টাতেই কোন এক মোটর মেরামতের কারখানায় ঢুকেছিল। সঙ্গী একরাশ উচ্ছৃঙ্খল ছোকরা। সংসারে বিশেষ সাহায্য করা দূরে থাক্—বরং জানলার তাকে, টেবিলের ওপর খুচরো পয়সা পড়ে থাকলে নিখোঁজ হত।

বাবা কেবল কপাল চাপড়াতেন। কাতরোক্তির সঙ্গে নিজের আক্ষেপ মিশিয়ে মাঝে মাঝে বলতেন, সব আমার বরাত। কারুর দোষ নয়। ভগবান বাদী, মানুষ কি করতে পারে, কতটুকু!

আপনার হয়তো এসব পড়তে ভাল লাগছে না। অন্য খাতায় কাশ্মীরের নিসর্গ শোভা কিংবা কাঞ্চী-কোশলের মন্দিরের কারু-কার্যের বিবরণের পরে এমন একটা ভাঙা সংসারের একঘেয়ে কাহিনী শুনতে কারই বা ভালো লাগে। কিন্তু আমার অক্ষমতার কথা আগেই তো আপনাকে জানিয়েছি। পুরী রাঁচী দূরে থাক্, মাত্র একবার দূর সম্পর্কের এক মাসির বাড়ি গিয়েছিলাম কোন্নগর। সেই সময়েই হাওড়া স্টেশন দেখি। স্কুলে মাইনে দিয়ে পড়বার মতন সঙ্গতি আমাদের সংসারে ছিল না, তাই রান্না আর ঘরের কাজকর্ম করার ফাঁকে ফাঁকে পড়ার বই নিয়ে বসেছি। হাজার ফাই-ফরমাশ খাটার অবসরে বীজগণিতের ফরমূলা মুখস্থ করেছি, শকুন্তলার পতিগৃহে যাবার প্রাক্কালের উপদেশাবলী পড়েছি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জীবনে কোনদিন সে উপদেশ কাজে লাগবে না জেনেও।

অবশ্য ছোট ভাই বেশী দিন বাপের সংসারে রইল না। একদিন গলির মোড়ে জ্বলন্ত বিড়ি মুখে বড়দার সামনে ধরা পড়তে চোরের

মার শুরু হল। পরদিন থেকেই ছোড়দা নিখোঁজ। বালিশের তলায় এক চিঠি পাওয়া গেল। কেউ যেন তাকে খোঁজার চেষ্টা না করে। তাকে মৃত বলেই যেন ধরে নেয়।

চিরকুটটা চোখের সামনে ধরে বাবা অনেকক্ষণ বসে রইলেন। ঘোলাটে হুটো চোখ বাষ্প ঘনিয়ে এল। থরথর করে কেঁপে উঠল হুটো ঠোঁট। ছেলের শোকে, না ছেলের রোজগারের টাকার ক্ষোভে ঠিক বোঝা গেল না।

আশী টাকার অংশীদার হল তিন জন।

বড়দা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত অফিসের চৌকাঠে মাথা ঠুকে ফিরতে লাগল, কিন্তু ওই মাথা ঠোকাই সার। এক মুচি ছাড়া এ পর্যটনে আর কারও লাভ হল না। চেনা-জানা অনেক বন্ধুকেই বাবা চিঠি লিখে দিলেন, সেই চিঠি নিয়ে বড়দা অনেক ঘুরল। প্রচুর সহানুভূতি, অযাচিত উপদেশ, কী ভয়াবহ দিনকালই শুরু হয়েছে এ সম্বন্ধে আক্ষেপ -এ ছাড়া পিতৃবন্ধুদের কাছ থেকে আর কিছু পেল না বড়দা।

বিশ্বাস করুন, ইনিয়ে-বিনিয়ে গার্গী-মৈত্রেয়ী-অরুন্ধতীর গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী লেখার চেষ্টা করতে পারতাম। 'না জাগিলে ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না'—এমন এক মুখরোচক কবিতার স্তবক ফলিয়ে ফাঁপিয়ে অনায়াসে লিখতে পারতাম পাতাখানেক; বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত স্ত্রী-স্বাধীনতার স্রোত কিভাবে কোথায় কতখানি বাঁক রচনা করে, কতটা আবর্ত সৃষ্টি করে তটপ্লাবিনী হবার সুযোগ পেয়েছে, অনেক ভেবেচিন্তে সে সম্বন্ধেও কিছু লিখতে পারতাম—কিন্তু সে স্রোতের উচ্ছল বেগে নিজে হারিয়ে যেতাম, হারিয়ে যেত মধ্যবিত্ত এক পরিবারের মর্মন্তুদ কাহিনী।

এতদিন পরে শিকে ছিঁড়ল। বড়দার তীর্থযাত্রার পরিসমাপ্তি। তবে আশ্বাস-দেওয়া কোনও বড় অফিসে চেয়ার জুটল না, কোনও

মাড়োয়ারীর গদিতে তাকিয়া নয়, ঘুরে ঘুরে সেই মোটর-কারখানা—যেখানে ছোড়দা মিস্ত্রীগিরি করত। তবে কাজটা মিস্ত্রীগিরির নয়, হিসাব লেখার। যন্ত্রপাতির বদলে কলম যে হাতে উঠল, দু-এক বছর কলেজে পড়া বড়দার কাছে সেটাই পরম সান্ত্বনা। উদয়াস্ত খাটুনি—কিছু আয় বাড়ল, খুব সামান্য।

এবার সকলের নজর পড়ল আমার দিকে। সে নজরে বিস্ময়ের ছিটে।

আঁস্তাকুড়ে অযত্নে পোঁতা লাউয়ের ছোট চারা পৃথিবীর রোদ আর বাতাস আহরণ করে হঠাৎ যদি চকচকে লাউতলায় পরিণত হয়, আঁস্তাকুড়ের আস্তানা ছেড়ে প্রাণের তাগিদে লতিয়ে উঠতে চায় গৃহস্থের বাঁশের খুঁটিতে—তখন যেমন কিছুটা ভয়, কিছুটা বিস্ময় থাকে গৃহস্থের দুচোখের দৃষ্টিতে—বাবা আর বড়দার চোখে তারই ছায়া। ঘন সবুজ পাতা, সতেজ ডগা, মাচা না বাঁধলে আর বুঝি চলে না। বাবার পরামর্শে বড়দা মাচা বাঁধার আয়োজনে লাগল।

দিন সাতেকের মধ্যেই এসে হাজির। একদল ছোকরা। চেহারা দেখে মনে হল যাত্রাপার্টির লোক। কর্ণেট আর ক্লারিওনেট ফুঁকে ফুঁকে তোবড়ানো গাল, চোপসানো বুক। এদের আসার খবর আগেই পেয়েছিলাম। মার ট্রাঙ্ক থেকে পুরানো শাড়ি বের করে শরীরে জড়িয়ে নিলাম। আধভাঙা আয়নায় অনেক কসরত করে খোঁপা বাঁধলাম, কপালে কুঙ্কুমের টিপ। সস্তা পাউডারের প্রলেপ নিলাম মুখে ঘাড়ে। উপায় নেই, নিজেকেই সাজতে হল। উঁকিঝুঁকি দিয়ে বাবা খোঁজখবর নিলেন। সময়োচিত উপদেশ।

সামনে বসতেই চোখা-চোখা প্রশ্ন শুরু হল। পাকপ্রণালী থেকে শৌখীন জীবনযাত্রা প্রণালী। কম তেলে রান্নার কসরত থেকে কম চুলে পনি-টেল বাঁধার কায়দা। হাবে ভাবে মনে হল

উংরে গেলাম। তারপর আমি উঠে আসতে বাবা আর বড়দার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হল। খবব পেলাম রাত্রে। বাবা আর বড়দাকে খেতে দেবার সময়।

আশ্চর্য কাণ্ড, ওই তো পাত্রের ছিরি। তেলের কলে হিসাব লেখে অথচ নগদ টাকাব কামড় কম নয়।

বাবা কোনো উত্তব দিলেন না। মাথাটা আবো নিচু করে খেতে শুরু করলেন। দবজাব পাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ শুনে গেলাম।

তাবপব এদিক-ওদিক থেকে মাঝে মাঝে দু-এক জন আসতে লাগল। আমাবও গা-সওয়া হয়ে গেল। বিকেলে গা ধুয়ে নিজেই সাজবাব চেষ্টা কবতে লাগলাম। আধবুড়ো লোক দেখতে আসছে শুনলে কপালে বড় কবে টিপ, পায়ে আলতা। টান করে বাঁধা খোঁপা। আবার পাত্র কিংবা তার বন্ধুবা আসছে শুনলে ছোট্ট টিপ. এলো খোঁপা, হালকা পাউডাবের প্রলেপ। কাজলের টানে চোখদুটো আয়ত কবার প্রয়াস। কিন্তু সবই বৃথা। রূপের টানে যাবা একটু বা টলল, তাবা আটকালো বাপেব রুপোব ঘাটতিতে। নগদ টাকা আব সোনাদানাব যা ফর্দ মেলে ধবল বাপেব দম বন্ধ হবাব যোগাড়।

ওবই মধ্যে একদিন এক প্রৌঢ় এসে হাজিব। খবব না দিয়েই। সামনেব গুটি-চাবেক দাঁত নেই। গলায় আধময়লা চাদর। চোখে ডাঁটিভাঙা চশমা তাতে সুতোব কাবসাজি। জানালেন তিনিই পাত্র। গত ফাল্গুনে স্ত্রী দেহ বেখেছেন, দ্বিতীয়বাব সংসার পাতবার আশায় বয়স্থা কন্যাব সন্ধানে বেরিয়েছেন। বাবা বাড়িতে ছিলেন না। বিকেলেব দিকে মাঝে মাঝে লাঠি ধবে সামনের পার্কে টহল দিয়ে আসেন। বড়দা সবে ফিরেছে কাজ থেকে। লোক-টিকে দরজা থেকেই বিদায় করে দিল।

আবার বাপ আর ছেলেতে বাত্রে কথা হল। শুতে যাবার আগে কান পেতে শুনলাম।

ভেবেছিলাম বাবা হয়তো বড়দাকে সমর্থন করবেন এমন একটা বিবাহ-বিলাসীকে পাত্তা না-দেওয়ার জন্য। কিন্তু মনে হল তিনি যেন একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছেন। আস্তে আস্তে বললেন,—দরজা থেকে তাড়াবার কি দরকার ছিল। না-হয় দেখেই যেত। এসব লোকের খাঁইও কম। মেয়েরও কষ্ট হত না। তাছাড়া জোয়ান পাত্র আর জোটাবই বা কি করে! দেখছিস তো হাল চাল। এক এক জন যে পরিমাণ টাকা চাচ্ছে, আমাদের বিক্রি করলেও তা হবে না।

মাথার বালিশে মুখ ঢেকে সারা রাত কাঁদলাম। বিশ্বাস করুন, যদি সে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের আস্তানা জানা থাকত তাহলে সেই রাত্রেই তাঁর পায়ের ওপর গিয়ে নিজেকে নিবেদন করতাম। বলতাম—আমায় নিন, গ্লানি থেকে, অপমান থেকে, অমর্যাদা থেকে আমায় মুক্তি দিন!

হয়তো আপনি বিরক্ত বোধ করছেন। আপনার খাতা দেখার মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু বেশীক্ষণ আপনার সময় অপচয় করব না। মধ্যবিত্ত ঘরের নিঃসম্বল মেয়ের কাহিনী ক'টা পাতা জুড়েই বা হতে পারে? একটু ধৈর্য ধরুন।

বাবা মারা গেলেন। একেবারে হঠাৎ। মাঝরাতে একবার আমার নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন। ঘরের মেঝেতেই আমার বিছানা। উঠে-পড়লাম। তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিয়ে দেখলাম বাবা দু'হাতে বুক চেপে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছেন। চোখে-মুখে প্রাণান্তকর যন্ত্রণার ছাপ।

কি হয়েছে, বাবা?

উঃ, বড় কষ্ট হচ্ছে রে—

অস্ফুট চিৎকার করে উঠলাম। পাশের ছোট ঘরে দাদা। আওয়াজে এ ঘরে ছুটে এল। মোড়ের হোমিওপ্যাথ অতুল সরকারকে আনা হল। তিনি ওষুধ কিংবা ভরসা কিছুই দিলেন

না। বললেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনারা বরং বড় কাউকে কল দিন।

কাকে কল দিতে হবে, সে আভাসও দিলেন। জনার্দন শিকদার। নামকরা হার্ট-স্পেশ্যালিস্ট। তাঁর ওষুধে নির্জীব হার্ট নাকি ল্যাংকাশায়ার বয়লারের মতন তেজী হয়ে ওঠে। তুলসী-তলায় রাখা রোগী আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে।

ডাক্তার শিকদারের চিকিৎসার গুণের পাশাপাশি তাঁর দর্শনীর মাত্রাটাও বললেন। চৌষট্টি টাকা। মাসের শেষে কুড়িয়ে বাড়িয়ে যে সংসারে চৌষট্টি আনা যোগাড় করা দায়, সে সংসারে এ দর্শনী চৌষট্টি মোহরের সামিল। দাদা আড়চোখে আমার হাতের দিকে চোখ ফেরাল। ছুগাছা কাচের চুড়ি। মার রেখে যাওয়া যে ছুগাছা বালা ছিল, সেটা বাবার আগের অসুখের সময় পোদ্দারের দোকানে গিয়েছিল, আর ফিরে আসে নি।

তবু দাদা একবার শেষ চেষ্টা করল। বাক্স-প্যাঁটরা হাঁটকালো, রান্নাঘরে গিয়ে বাসনপত্রের হিসাব নিল, তারপর ছুটে চলে গেল বাইরে। পড়শীদের কাছে যদি কিছু পাওয়া যায়, এই আশায়।

ভোরের দিকে দাদা ফিরল, হাতের মুঠোয় গোটা ত্রিশেক টাকা। অবশ্য পরিশ্রমই সার। এ টাকায় একূল-ওকূল কোনো কূলই রক্ষা হল না। আমার কোলের ওপর মাথা রেখে বাবা তখন সব চিকিৎসার বাইরে।

গোলোকবাবু আবার টান হয়ে বসলেন। ঝাপসা হয়ে এসেছে চশমার কাচ ছুটো। পরিষ্কার করে কিছু পড়া যাচ্ছে না। কোঁচার খুঁটে নিজের ছুটো চোখ মুছে নিলেন। অজান্তেই চোখের কোণে জল জমে উঠেছে।

মুখ তুলে সামনের দিকে চাইলেন। মোমের বাতিটা গলে গলে পড়ছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে নরম মোমের রাশ।

স্তিমিত শিখা। দমকা বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কেমন যেন ভয়-পাওয়া ভাব।

ভালোই লাগল গোলোকবাবুর। একটানা নোটবই মুখস্থ করে উগরে-দেওয়া বর্ণনার পরে এমন একটা বেদনাবিধুর কাহিনী পড়তে সত্যিই ভালো লাগল।

আবার তিনি ঝুঁকে পড়লেন খাতার ওপরে।

এতদিনের পুবোনো একটা মানুষ কত সহজে ফুরিয়ে যায় তা নিজেব চোখে দেখলাম। মুখোমুখি মৃত্যু দেখা এই আমার প্রথম। সংসাবের গভীরে প্রবেশ কবেছিল শিকড়ের জাল, মনে হয়েছিল এত আচমকা এমন একটা মহীরুহ বুঝি শেষ হয়ে যেতে পারে না।

দাদা চোখ মুছল, আমিও। পঙ্গু অথর্ব একটা লোক সংসারের কতটা জায়গা জুড়ে ছিল তা পলে পলে অনুভব করলাম। দিন যেন আর কাটে না। দাদা বেরিয়ে যাওয়ার পর অখণ্ড অবসর। 'শুয়ে-বসেও সময় শেষ হয় না। কিন্তু আর এক উপদ্রব জুটল। পাড়ার বকাটে ছেলেদের ঘোরা-ফেবা শুরু হল। ইনিয়ে-বিনিয়ে রসিকতার চেষ্টা, হালকা গানেব কলি। অবস্থা আরও চরমে উঠল। নিয়মিত জানলায় টোকা, মাঝে মাঝে চিঠিপত্র খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে। অতিষ্ঠ হয়ে দাদাকে জানালাম। গালে হাত দিয়ে দাদা ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর পাশের বাড়ির সঙ্গে একটা ব্যবস্থা হল। আধবুড়ো ভদ্রমহিলা, পাড়ার বেওয়ারিশ পিসি প্রহরী মোতায়েন হলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরই চলে আসতেন আমাদের বাড়ি। সারাদিন আগলে, দাদা ফেরার পর বাড়ি যেতেন। কতকটা বাঁচোয়া। জানলায় করাঘাত বন্ধ হল, পত্রাঘাতও। কিন্তু ওরই মধ্যে গানের দু-এক লাইন চলতে লাগল। চল্‌তি সিনেমার হাল্‌কা গান।

দাদা আবার জোর দিল বিয়ের দিকে। ঘটক হাঁটাহাঁটি শুরু করল। মাঝে মাঝে পাত্রপক্ষও। আবার সেজেগুজে বসতে হল তাদের সামনে। প্রসাধন সেরে। কিন্তু এবার তারা সরাসরিই নাকচ করে দিল। প্রায় মুখের ওপরেই।

তাদের দোষ নেই। আমার শুধু দুঃখই বাড়েনি, বয়সও বেড়েছে। যৌবন হয়তো এসেছিল, কিন্তু তাকে অভ্যর্থনা করে দেহের দেহলীতে আনার সামর্থ্য ছিল না। প্রায় ধুলোপায়েই বিদায় দিতে হয়েছিল। অঙ্গের শ্যামবর্ণ অভাব-অনটনে শ্যামলতর হয়েছে, চোখের কোণের কালি আরও গভীর, শিরা-উপশিরার জট আরও প্রকট।

প্রায় মাস-ছয়েক চেষ্টা করার পরে দাদা হাল ছাড়ল। অফিসের পরে একেবারে রান্নাঘরে আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

তোর সঙ্গে একটা কথা আছে, সবি।

আঁচল চেপে কড়া নামাচ্ছিলাম, দাদার দিকে ফিরে বললাম, আমার সঙ্গে কথা!

কথা আর কিছু নয়। দাদার ইচ্ছা আমি আবার লেখাপড়া শুরু করি, শুধু বিয়ের পরিখা পার হবার জন্য নয়, জীবিকা হিসাবে প্রয়োজন হলে যাতে কাজে লাগাতে পারি।

অবাক হলাম। জীবিকা! যেখানে পুরুষরাই ঠাঁই পাচ্ছে না, সেখানে মেয়েরা করবে জীবিকার চেষ্টা? বিশেষ করে আমার মতো মেয়ে।

দাদা বোঝালো। কোনো অসুবিধা নেই। আজকাল দলে দলে মেয়েরা পথে বেরিয়েছে। শখ মেটাতে নয়, জীবন বাঁচাতে। লেখাপড়া জানা মেয়েদের পক্ষে চাকরি পাওয়া বরং কিছু পরিমাণে সহজ।

লেখাপড়া শুরু হল। খুঁজে খুঁজে দাদা এক আধবুড়ো মাস্টারও যোগাড় করল। সকাল বিকাল এক ঘণ্টা করে

পড়িয়ে যান। অবশ্য বিনামূল্যে নয়। ফলে, অফিসের কাজের পরেও দাদা টিউশনি শুরু করল। ভোরে বেরিয়ে যেত, ফিরত রাত দশটায়। যেমন বিদ্যা, দর্শনীও সেরকম। রাই কুড়িয়ে বেল। যখন দাদা বাড়ি ফিরত তখন মুখের দিকে আর চাওয়া যেত না। কতদিন দেখেছি জানলার গরাদে ভর দিয়ে হাঁপাচ্ছে।

কতদিন বলেছি, আমার আর লেখাপড়া শিখে দরকার নেই দাদা। বসদ যোগাতে তোমার শবীরটা যে পাত হয়ে যাচ্ছে !

হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে দাদা ম্লান হাসত। নারে, না, আমাব কিছু কষ্ট হয় না। আর একটা বছর, তারপরই তুই ম্যাট্রিক পাস করবি। আমাব বন্ধু সুশোভন বলেছে ম্যাট্রিক পাস মেয়েদেব চাকরি দেবাব হাত তাব কাকার আছে। তুই আর আমি চাকরি করলে দেখবি অবস্থা ফিরে যাবে আমাদেব।

সেই অবস্থা ফিরে যাওযাব দিনেব কল্পনায় দাদাব মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

শুধু প্রাইভেট টিউটরই নয়, বাজার ফেরত দাদা মাঝে মাঝে মাখনের প্যাকেট, বড় মাছের টুকরোও আনতে শুরু কবল। কিছু বললে হাসত,—পাসের পড়া, মাথার খাটুনি কম! শাক-চচ্চড়ি খেয়ে খেয়ে শুধু পেটে নয়, মাথাতেও চড়া পড়ে যাবে যে। শেষে পরীক্ষাব হলে মুখ থুবড়ে পড়বি।

পরীক্ষার হলে মুখ থুবড়ে যে পড়িনি তাব যথেষ্ট প্রমাণ আপনি পাচ্ছেন।

খাওয়া-দাওয়ার পরে বড়দা একদিন কাছে ডাকল,—কপালে হাত দিয়ে একটু ছাখ্ তো, গা-টা যেন গরম বলে মনে হচ্ছে—

পড়ার বই নিয়ে বসেছিলাম, বই সরিয়ে দাদার ঘরে ঢুকলাম। কপালে হাত রাখা যায় না। বেশ গরম। দাদাকে বললাম সে-কথা।

এই জ্বরের ওপর কি বলে ভাত খেলে তুমি ?

ও কিছু নয়—দাদা উপেক্ষার হাসি হাসল, গা একটু গরম রোজই হচ্ছে।

রোজ ?

দাদা উত্তর দিল না। পায়েব তলা থেকে পাতলা চাদব নিয়ে গায়ে ঢাকা দিল।

সে বাতে পড়া হল না। দাদাব মাথাব কাছে বসলাম।

তোমাব খাটুনি বড্ড বেশী হচ্ছে, দাদা। বাতেব টিউশনিটা ছেড়ে দাও দিকিনি ?

তোর পরীক্ষাব তো আব মাস-তিনেক, তাবপবে ছুটো টিউশনিই ছেড়ে দেব। ভাইবোনে একসঙ্গে বেবোব চাকবি করতে, হয়ত এক ট্রামে, কি বলিস—

আমি কিছু বললাম না, যা-কিছু বলাব ডাক্তাবই বললেন। প্রাইভেট টিউটরকে বলে এক ডাক্তাব ডাকালাম, প্রায মাসখানেক পব। দাদাব চেহাবা আমাব ভালো ঠেকল না। সাবাটা বাত একটানা গোঙানি।

ডাক্তাব অনেকক্ষণ ধবে দেখলেন। বুক, পিঠ, জিভ, চোখেব কোল। তাবপব যাবাব সময়ে বলে গেলেন বুকেব একটা এক্স-বে কবাতে। তাব আগে কিছু কবা সম্ভব নয়।

দাদা বেঁকে বসল। উঁহু, এ মাসে তোব পবীক্ষাব ফী জমা দিতে হবে, এ মাসে কোনও বাড়তি খবচ নয়।

একটু ধৈর্য ধরুন। আমাব কাহিনী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পৃথিবীতে ছুফোঁটা চোখেব জল কতটুকুই বা জায়গা জুড়ে থাকে! কি-ই বা তাব দাম, তাও এক মধ্যবিত্ত মেয়ের চোখের জল।

জোব কবেই দাদাকে ভর্তি করা হল। অনেক ধরাধরির পর। পাড়ার ছু-এক জন কিছু সাহায্য করেছিলেন—অর্থ দিয়ে নয়, সামর্থ্য দিয়ে।

পরীক্ষা শেষ করেই দাদার কাছে গিয়ে বসি। রোজ। পরীক্ষার খবর জিজ্ঞাসা করে, মাঝে মাঝে প্রশ্নপত্র দেখে, কিন্তু নিজের কথা এড়িয়ে যায়। বলে, ভালো আছি রে, এইবার সেরে উঠব। আমার চাকরিটা আছে কি-না একবার খোঁজ নিস তো।

দাদার এক্স-রে প্লেট ডাক্তারেরা দেখিয়েছে। দুটো ফুসফুসই কীটদীর্ণ। একটু দেরি হয়ে গেছে, আর-একটু আগে এখানে আনলে তাঁরা একবার চেষ্টা করে দেখতেন। বিজ্ঞানের মাধ্যমে নতুন প্রক্রিয়ায় সর্বনাশা কীটের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতেন।

এ কথার কোনো উত্তর দিই নি। বোধ হয় কোনো উত্তর ছিলও না। এ কীটের ল্যাটিন নাম জানি না, বাংলা নাম, দারিদ্র্য। দাদার ফুসফুসকে আক্রমণ করার বহু আগে এ কীট অনুপ্রবেশ করেছে সংসারের শিরায় শিরায়। তার এক্স-রে প্লেট দেখলে ডাক্তাররাই বোধ হয় স্তম্ভিত হয়ে যেতেন।

কাল বিকেলে পাকা খবর পেয়ে গেছি। নার্সের মারফত, ডাক্তারের মারফত। শুধু দাদার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাই শেষ দিন পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে আসতে হবে। তবে লেখার পালা আজ শেষ। কাল থেকে সাদা খাতায় একটি আঁচড়ও কাটব না, কালির সামান্য কলঙ্কও নয়।

এইখানেই লেখা শেষ। আরো দু-একটা কথা লিখেছিল, কিন্তু তা অস্পষ্ট। নিজেই কেটে দিয়েছে কিংবা চোখের জলে মুছে গিয়েছে।

গোলোকবাবু খাতা সরিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। জানলার ফাঁক দিয়ে আলোর ছটা আসছে। ভোরের আলো।

মোমবাতিটা গলে শেষ। ভোরের হাওয়ায় কখন নিভে গেছে। এদিক-ওদিক চেয়ে চেয়ে গোলোকবাবু দেখলেন। কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই, আবছা নয় কিছু। সারি সারি ছেলেমেয়েরা

শুয়ে রয়েছে। সংসারের খুঁটিনাটি সব-কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। রাতের মায়া আর নেই।

গোলোকবাবু বিরক্ত হলেন। এখনও গোটাচারেক খাতা বাকী। অযথা এতটা সময় নষ্ট। একটা অর্বাচীন মেয়ের ছিঁচ-কাঁদুনির কাহিনী। অর্থহীন প্রলাপ।

শক্ত হাতে লাল পেন্সিল ধরে গোলোকবাবু খাতার ওপরে বিরাট এক শূন্য আঁকলেন। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হলেন না। খসখস করে কি-সব মন্তব্য লিখতে লাগলেন। পরীক্ষকের দায়িত্ব বড় কম নয়। এসব জিনিসের প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত। হেড-একজামিনারের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করানো কর্তব্য। পরীক্ষা একটা ছেলেখেলা নয়! জীবনসাধনা। কিংবা বুঝি তার চেয়েও বেশী।

॥ প্রতিচ্ছায়া ॥

চাকরিতে ঢোকার পরও মালতী অনেক দিন দেখেছে।

বেঁটে চেহারা, খোঁচা খোঁচা চুল, কুতকুতে চোখ। পরনে হাফ-প্যান্ট, তালি দেওয়া। গায়ের গেঞ্জি কোন এক সময়ে হয়তো মরাল-শুভ্র ছিল, আজকাল মসীবর্ণ। জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে।

সোজা গিয়ে দাঁড়ায় প্রোপ্রাইটারের কাছে।

খদ্দেরদের চা, ডিম, টোস্ট যোগাতে যোগাতে মালতী চেয়ে চেয়ে দেখে। কথাবার্তার কিছুটাও কানে যায়।

রোজই তো ঘোরাচ্ছেন, আড়াই টাকা পাওনা আদায় করতে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে গেল।

ছোকরার গলা সপ্তমে।

প্রোপ্রাইটার মেদিনী পাঁজা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, ওজন সাড়ে তিন মণের কাছাকাছি। বিশেষ ওঠাহাঁটা করতে পারে না। কোন রকমে রিক্সায় আসে, রিক্সায় যায়। জাঁদরেল গোঁফ, ইদানীং পাক ধরেছে। হুংকারে পরিতোষ কাফে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে।

পাওনা আবার কিসের রে বদনা? মেদিনী পাঁজা গর্জন করে উঠে, কাপ ডিশ এই ক-মাসে কটা ভেঙেছিস, সে খেয়াল আছে? উল্টে আমারই পাওনা হয়েছে চার-পাঁচ টাকার ওপর! এ সব বাজে দোকানের খেলো কাপ ডিস নয়, দস্তুরমত বিলিতি মাল। পরিতোষ কাফেতে বাজে জিনিস ঢোকানো হয় না।

কথা শেষ করে মেদিনী পাঁজা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসা খদ্দেরদের ওপর নজর বোলায়।

কাপ ডিসের দাম তো আপনি মাস মাস কেটেছেন মাইনে থেকে। বদন গলার স্বর একটুও খাদে নামায় না।

সব আর কাটতে পারলাম কোথায়। তখন তো পায়ে ধরে আরম্ভ করেছিলি। বাপের অসুখ, মায়ের অসুখ, হাজার বায়নাক্কা। তোদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে আছে। নেমক-হারামের দল কোথাকার।

এবার কথা শেষ করে মেদিনী পাঁজা আড়চোখে বাইরের ফুটপাথের দিকে চোখ ফেরায়।

ফুটপাথের ওপর জন তুয়েক। তারা বয়সে বদনের চেয়ে বড়, চেহারাও একটু ভদ্র গোছের। তারাই বদনকে ভিতরে পাঠিয়েছে। প্রোপ্রাইটারের কাছ থেকে পাওনা আদায়ের চেষ্টায়।

এদের তিন জনকে মালতী চেনে। মালতীরা চাকরি পাবার আগে এরাই এখানে কাজ করত। 'বয়'-এর কাজ। আজ মালতীরা যে কাজ করছে। হঠাৎ মেদিনী পাঁজার খেয়াল হল, পরিতোষ কাফের অবস্থা ফেরাবে। বকাটে ছোকরাদের হটিয়ে মেয়েছেলে আমদানি করবে। রংচঙে শাড়ী-জামা-পরা, সোমত্ত বয়সের মেয়ে। আজকাল এধার-ওধার বড় বড় দোকানে এই রেওয়াজ। খদ্দের বাড়াবার এমন ওষুধ আর নেই। যারা সাতজন্মে দোকানের চৌকাঠ মাড়াত না, তারাও এখন সন্ধ্যার ঝোঁকে এক কাপ চা কিংবা একগ্লাস লস্যি খেতে ঢোকে। এক কাপ চা খেতে আধ ঘণ্টার ওপর কাটিয়ে দেয়। ওরি মধ্যে মাসের প্রথম দিকে তু-একটা বাড়তি অর্ডারও দেয়। নোস্তা বিস্কিট কিংবা সস্তা পাউরুটির টুকরো।

মাসখানেক ধরে বদন সমানে যাওয়া আসা করল। কিছুদিন

পরে বাকি ছোকরা দুজনকে আর দেখা গেল না। বোধ হয় তারা কোথাও চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে।

অবস্থা একদিন চরমে উঠল। ছুটির দিন। খদ্দেরের ঝামেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার দাখিল। বদন এসে হাজির। চেহারা যেন আরো শীর্ণ, আরো জরাজীর্ণ পোশাকের অবস্থা।

একেবারে সোজা গিয়ে দাঁড়াল মেদিনী পাঁজার সামনে।

আজ আর কোন কথা শুনব না। পাওনা নিয়ে তবে উঠব। রোজ রোজ বাজে ওজর দিয়ে হটিয়ে দিচ্ছেন কেবল।

মেদিনী পাঁজা পয়সা গুণছিল। নোট আর পয়সা আলাদা করে রাখছিল আলাদা কৌটায়। বদনের চিৎকারে গোনা ভুল হয়ে গেল। রোষকষায়িত চোখ তুলে বদনের দিকে চাইল।

বদনের খেয়াল নেই।

টাকা কটা মিটিয়ে দিন। সোজা কথা। নইলে এ পাড়ায় দোকান করা বের করে দেব, হুঁ।

এবার রোষ নয়, মেদিনী পাঁজার দুচোখে অগাধ বিস্ময়। এ যেন হাতির সামনে আরশোলার ফরফরানি।

একটা চোখ বুজে মেদিনী পাঁজা ঠোঁট দিয়ে দাঁত কামড়ে শুধু বলল, পিঁপড়ের পাখা উঠেছে দেখছি যে? মরবার আর দেরি নেই।

রাখুন মশাই, ও তড়পানিতে বদন রানা ভয় পায় না।

ব্যস, বদনের কথা বদনের মুখেই থেকে গেল। পাঁজা সামনে ঝুঁকে পড়ে আচমকা হাত বাড়িয়ে বদনের ঝাঁকড়া চুলের গোছা আঁকড়ে ধরল, তারপর আর-এক হাতে বিরাশি সিক্কার এক চড় তার গালে।

প্রথমে সামনের খালি চেয়ারে ধাক্কা তারপর উল্টে জড়ো করে রাখা পেয়ালা পিরিচের ওপর। গোটা দুই-তিন পেয়ালা গুঁড়িয়ে চুরমার। বদনের কপালে আধ-ইঞ্চি ক্ষত। এই চিমসে চেহারায় এত রক্তও ছিল!

খদ্দেররা হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। দু-এক জন টেনে তুলল বদনকে। পাঁজার তখন নটরাজ মূর্তি। এক হাতে খসে-পড়া কাপড়টা জাপটে ধেই ধেই করে নাচছে।

আজ খুনই করে ফেলব তোকে, দেখি তোর কোন্ বাবা বাঁচায়। আমার দোকানের বদনাম? আমার দোকানে যত ছোটলোক খদ্দেরের আমদানি?

ওরই মধ্যে বিড়বিড় করে কি বলতে যেতেই পাঁজা আবার ফেটে পড়ল, এক থাপ্পড়ে তোকে একেবারে নিকেশ করে দেব। হারামজাদা, বদমাইশ কোথাকার।

যে দু-এক জন খদ্দের এগিয়ে গিয়ে বদনকে তুলেছিল, খদ্দেরের বদনামের কথা কানে যেতেই তারা একটু একটু করে পিছিয়ে গেল। সার দিয়ে দাঁড়াল পাঁজাকে ঘিরে।

বদন উঠে একেবারে দরজার কাজ বরাবর গিয়ে দাঁড়াল। গতিক সুবিধার নয়।

পাঁজা পয়সার কৌটা সামলে আবার বসে পড়ল। খদ্দেরের সামনে হাতজোড় করে বলল, অপরাধ নেবেন না মশাইরা। আপনাদের শান্তিভঙ্গ হল। আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু আমার দোকান আর খদ্দেরকে অপমান করলে, কেমন মাথায় রক্ত চড়ে যায়। জ্ঞান থাকে না।

কি হয়েছিল কি? ওরই মধ্যে দু-এক জন ব্যাপারটা জানবার চেষ্টা করল।

আরে ও ছোকরা কাজ করত এখানে। কাপ ডিশ ভেঙে কেলেঙ্কারি। তার ওপর জিনিসপত্র চুরি। দিলাম বেটাকে বের করে। এখন এখানে ওখানে দোকানের নিন্দে করে বেড়ায়। বলে কি জানেন? যতো ফোতো কাপ্তেনের আড্ডা এই পরিতোষ কাফেয়। এক কাপ চা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে বাবুরা। শুনুন কথা। কতবড় বুকের পাটা।

মেদিনী পাঁজা সকলের মুখের দিকে একবার চেয়ে নিল।

তিন নম্বর কেবিন থেকে বেরোবার মুখে মালতী দাঁড়িয়ে সব দেখল। বদন কি করতে মাঝে মাঝে আসে তা তার অজানা নয়। মাইনের তাগাদার কথা সে নিজের কানেও শুনেছে। মেদিনী পাঁজা দিনকে রাত করতে পারে, সাদাকে কালো। আসল ব্যাপারটা বেমালুম পাল্টে দিল।

দরজার গোড়া থেকে বদন শেষ চেষ্টা করল, কেন মিছে কথা বলছেন মশাই? পাওনা চাইতে এলাম আর আপনি বেধড়ক পিটিয়ে দিলেন। বেশ, আমিও দেখে নেব আপনাকে। পথে ঘাটে বেরোবেন তো।

তবে রে। পাঁজা হুংকার ছাড়তেই বদন যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তীব্র বেগে রাস্তা পার হয়ে একেবারে ওপারে।

মেদিনী পাঁজাকে পথে ঘাটে বেরুলে দেখে নেবে ওই এক রত্তি বদন রানা। কথাটা মনে হতেই মালতীর হাসি পেল। শুধু এ তল্লাটে নয়, এদিকের সমস্ত এলাকায় মেদিনী পাঁজার অসামান্য প্রতাপ। গুণ্ডার দল যেমন জানা, পুলিসের লোকও তেমনি হাতের মুঠোয়। এর পরিচয়ও মালতী পেয়েছে।

মাস খানেক আগে রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে নতুন এক দোকানের পত্তন হল। ছোট চায়ের দোকান, পরিতোষ কাফের তুলনায় কিছুই নয়। গোটা দুয়েক টেবিল, খান চারেক চেয়ার আর বড় জোর গোটা চার-পাঁচ ফাটা আধ-ফাটা কাঁচের জার। বাসী কেক আর তোবড়ানো সস্তা দামের বিস্কুট। এমন বাহারে পরদা দেওয়া কেবিন নয়, এমন ঝলমলে ফ্লুয়োরেসেণ্ট বাতিও নয়। গোটা কয়েক হাড় জিরজিরে ছোকরা। দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে পাকড়াও করে আনা। মালিক বুঝি ভদ্রলোকের ছেলে। ফর্সা জামা-কাপড়-পরা নিরীহ চেহারার লোক।

কিন্তু পাঁজার টনক নড়ল। কিছু বলা যায় না। আজ ছোট

আছে, কাল বাড়তে কতক্ষণ। এ সব পাপ চারায় নষ্ট করাই ভালো। ভদ্দর লোকের ছেলে সেজেগুজে দশটা-পাঁচটা আপিস করলেই হয়, কিংবা কারবারই যদি করতে হয় তো ভদ্রগোছের কারবারেরও তো অভাব নেই। এ ব্যবসায় নামা কেন?

সন্ধ্যের ঝোঁকে পাঁজা মাঝে মাঝে দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিত। ও দোকানে খদ্দের ঢুকলেই দাঁত কিড়মিড় করত।

এর দিন দুয়েক পরেই ব্যাপারটা শুরু হল।

হঠাৎ বিকেলের দিকে হৈ চৈ চিৎকার। ফুটপাতে লোক জড়ো হয়ে গেল। কাজকর্মের ফাঁকে মালতী আর চাঁপাও উঁকি দিয়ে দেখে এল। থপ্ থপ্ করতে করতে মেদিনী পাঁজাও গিয়ে দাঁড়াল।

বোগাটে গোছের একজন তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। তার আগের দিন বুঝি এ দোকানে চা আর পাউরুটি খেয়েছিল, ব্যস্ সমস্ত দিন ধরে বমি আর দাস্ত। ডাক্তার বলেছে, খাবারে বিষ। পচা পাউরুটি আর বাজে চা। আদপে চা না অন্য কোন পাতার গুঁড়ো ভগবান জানেন। যে দু-একটা খদ্দের সস্তা চায়ের খোঁজে দোকানে ঢুকছিল, তারা পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল।

আসল ব্যাপারটা বোঝা গেল রাত সাড়ে দশটা নাগাদ। বাড়ি ফেরবার মুখে মালতী পাঁজার কাছে গিয়ে শেষ বিল বুঝিয়ে দিতে গিয়েই দেখতে পেল। সেই বোগাটে লোকটা কাউন্টারের একপাশে দাঁড়িয়ে। পাঁজা ভাঁজ-করা পাঁচ টাকার নোট একটা তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

তাতেও কিন্তু দোকান ওঠে নি। খদ্দের কম। টিম্ টিম্ করে চলছিল।

একদিন ভোরের দিকে পরিতোষ কাফেতে ঢোকবার মুখেই মালতী অবাক। চাঁপাও সঙ্গে ছিল। ফুটপাত লোকে লোকারণ্য। দু-একটা লাল পাগড়িও দেখা যাচ্ছে। একটু দূরে একটা দমকল।

তখনও পাঁজা এসে পৌঁছয় নি। কাজেই ভিতরে ঢোকবার উপায় নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথ-চলতি দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারটা জানল।

উনানের আগুন নেভাতে বুঝি ভুলে গিয়েছিল। কি করে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে চেয়ার, টেবিল, কাঠের কাউণ্টারে। সব পুড়ে ছাই।

পাঁজা সব শুনে কপালে দু-হাত ঠেকাল।

দয়াময়ী রক্ষা করেছেন। এই আগুন ছড়িয়ে পড়লেই সর্বনাশ হত। চত্বরকে চত্বর পুড়ে যেত। পরিতোষ কাফেও বাদ যেত না। যত সব বেয়াক্কেলে ব্যাপার। দোকান অমনি খুললেই হল। হুঁ।

কথার শেষে নাক দিয়ে পাঁজা ঘোড়ার ডাকের ধরনের একটা আওয়াজ করেছিল।

কিন্তু মালতীর মনে হয়েছিল, একটু খানির জন্য পাঁজার দুটো চোখের তারায় যেন আলোর ঝিলিক। রোদের ছোঁয়ায় নয়, অন্য কিছুর স্পর্শে।

কথাটা মালতী চাঁপাকে পরে বলেও ছিল।

চাঁপা পোড়-খাওয়া শক্ত সমর্থ মেয়ে। এর আগে দু-এক জায়গায় চাকরি করেছে। দুনিয়ার কঠিন দিকটার সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে। সহজে উচ্ছ্বসিতও হয় না, ভেঙেও পড়ে না।

সব শুনে সে বলল, ভালোই করেছে। কাছাকাছি দোকান থাকলে আমাদেরই ক্ষতি। খদ্দেরের মতিগতির কথা বলা যায় না। একটু অসুবিধা হলেই সুড়সুড় করে ও দোকানে গিয়ে উঠবে। পান থেকে চুন খসলেই চোখ রাঙাবে।

মালতী আর কথা বাড়াল না। রাস্তার ওপারের দোকান উঠে গেল। এখন সেখানে এক দর্জির দোকান। অষ্টপ্রহর কল চালানোর শব্দ এখান থেকেও পাওয়া যায়।

মালতীর এই প্রথম চাকরি। দোকানে থাকতেই ওর ভালো লাগে। কাজকর্মের মাঝখান দিয়ে সময়টা কেটে যায়। বাড়িতে পা দিলেই মেজাজ খারাপ হয়।

টিনের চাল আর টিনের বেড়া। ছোট্ট দু-খানা ঘর। মাঝেরটাতে মা শুয়ে। দিনরাত কামারের হাঁপরের মতন শ্বাসটানার শব্দ। একেবারে খানদানী হাঁপানী। বাইরের ঘরে বাপ। বসে বসে বিড়ি পাকায়। এ ছাড়া আর উপায়ও নেই। কাপড়ের কলে দুটো পা-ই খুইয়ে এসেছে। ক্রাচ বগলে কোন রকমে ওঠা হাঁটা করে। তাও ওই ঘরের মধ্যে।

মালতীর এই চাকরি হবার পর মা আর বাবা দুজনেই যেন নিশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছিল। বাড়তি আয় যেন বাড়তি ঘুলঘুলি। হাঁপিয়ে-ওঠা প্রাণে এক ঝলক বাইরের হাওয়া।

খাটুনি নেহাত কম নয়। সকাল থেকে রাত সাড়ে দশটা। মাঝখানে ঘণ্টা খানেক খাবার ছুটি। তবে দুপুরেব দিকে কাজ কম। মাঝে মাঝে খদ্দেরই থাকে না। তবু আসর সাজিয়ে বসে থাকতে হয়। ওরই মধ্যে পালা করে গড়িয়ে নেয় দুজনে। শুধু চাঁপা আব মালতীই নয়, মেদিনী পাঁজাও কাউন্টারে কাত হয়।

বদনকে মারার ব্যাপারটা নিয়েও চাঁপা আর মালতী আলোচনা করে।

মালতী বলে, দিয়ে দিলেই হত আড়াই টাকা। মিছামিছি ছোকরাটাকে মারধোর করা।

চাঁপা মুখ টিপে হসে, আড়াই টাকা আড়াই হাত মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায় না মালতী। তাছাড়া, খামোকা দিতে যাবেই বা কেন। হিসেব নিকেশ শেষ করেই ওদের চাকরি থেকে ছাড়ানো হয়েছে।

মালতী তবু নরম সুরে কাঁদুনি গায়, একেবারে হঠাৎ ছাড়িয়ে দেওয়া তো !

মালতীর কথা শেষ হবার আগেই চাঁপা খিল্‌খিলিয়ে হেসে ওঠে, ওদের হঠাৎ না ছাড়িয়ে দিলে হঠাৎ আমরা ঢুকতাম কি করে ? আরও কতদিন দরজায় দরজায় মাথা ঠুকে বেড়াতে হত, ঠিক আছে !

তা সত্যি। চাঁপার কি হত জানে না, কিন্তু মালতীর অবস্থা প্রায় শেষ ধাপে। মোড়ের কবিরাজের কাছে এক গাদা দেনা। আগের টাকা শেষ পাইটি শোধ না হলে আর তিনি চৌকাঠ মাড়াবেন না, এ কথা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছিলেন। তিন দিন বাপের একটানা জ্বর। কাজেই বিড়ি পাকানো বন্ধ, সেই সঙ্গে সঙ্গে পেটের ব্যবস্থাও।

কে কতটা হারালো দুনিয়ায় তার বিচার করলে চলে না, অন্তত মালতীদের নয়। আপনি বাঁচলে তবেই জন্মদাতার নাম।

দিন দশেক পরে। রাত প্রায় পৌনে এগারোটা। ঠিক পার্কের কাছ বরাবর। এইখান থেকেই চাঁপার সঙ্গে মালতীর ছাড়াছাড়ি হয়। মালতী যায় পুবে, চাঁপা সোজা। রেলিংয়ের ঝোপের পাশ থেকে কি একটা নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কাদা-গোলা জল ছিটকে এসে পড়ল চাঁপা আর মালতীর গায়ের ওপর। শাড়ি জামা সব নষ্ট।

কয়েকজন পথ-চলতি লোক এসে দাঁড়াল। কেউ কেউ আহা, উহু করল, আবার ওরই মধ্যে মুখ টিপে হাসলও দু-এক জন।

মালতীর চোখ ফেটে জল এল। শুধু জল হলেও কথা ছিল, শুকিয়ে নিলেই হত, কিন্তু চাপ চাপ কাদা আর পচা পাঁক। গন্ধে গা ঘুলিয়ে ওঠে।

ছু-এক জন উৎসাহী পার্কটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

কি করি বল তো চাঁপাদি। এ শাড়ি কেচে শুকিয়ে আবার ভোরে পরে আসব কি করে?

তোর বুঝি ধারণা আমার বাক্সবন্দী সব জর্জেট আর ক্রেপ সিল্ক।

চাঁপার গলায় বিরক্তির ছিটে। এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরনের শাড়িটা দেখল। মালতীর চেয়ে একটু কম, কিন্তু কাদার ছিটে তার শাড়িতেও বড় কম লাগে নি।

চাঁপাব বাড়ি খুব দূরে নয়, কিন্তু মালতীর অনেকটা পথ। বড় বড় রাস্তা ছেড়ে গলি উপগলি ঘুরে মাঠের মাঝখানে বস্তি। এত রাত্রে, এই বেশে এতটা পথ যাওয়াই মুশকিল। একবারে নিশুতি হয় নি। এদিকে ওদিকে লোকজন চলাফেরা করছে। পোশাকেব এই শ্রী দেখলে তারাই বা কি মনে করবে। এমনিতেই তো মাঝে মাঝে শিস আর বাজে ইয়ার্কির টুকরো কানে ভেসে আসে।

আব দেরি না করে ছুজনে হন হন কবে এগিয়ে গেল। সারাটা পথ চাঁপা গজ গজ করতে লাগল। মালতী চুপচাপ। কিছুদিন ধরে সকালেব দিকে একটা ট্যারা আধবয়সী লোক ওর পিছু নিচ্ছিল, আজ নিরালা গলিব মুখে পেয়ে তাকে আচ্ছা করে মালতী শুনিয়ে দিয়েছে।

বোধহয় এ তারই কাজ। এই ভাবেই শোধ তুলল। গায়ের ঝাল মেটাল।

পরের দিন মেদিনী পাঁজাকে বলি বলি করেও কথাটা বলল না। না চাঁপা না মালতী। বললেই বা কি হত। কোথায় মাঝরাতে কে কাদাঘোলা জল ছিটোল তাকে ধরা কি সহজ কথা। অবশ্য লোকের নাম বললে পাঁজা ঠিক শায়েস্তা করে দিত। সে রকম লোকও তার হাতে আছে।

দিন পাঁচ-ছয় নিরুপদ্রবে কাটল। আবার হঠাৎ এক রাতে ফেরার সময় কাগজে-মোড়া পচা গোবর এসে পড়ল মালতীর গায়ে। বোধহয় মুখে টিপ করেছিল, হাত ফসকে সারা গায়ে।

মালতী চিৎকার করে উঠল। চাঁপা ছুটে গেল সামনের দিকে।

অস্পষ্ট একটা মূর্তি, কিন্তু চাঁপার নজর এড়াল না।

মালতী, আমি ঠিক দেখতে পেয়েছি। বদনা ব্যাটাচ্ছেলেব কাজ। ঝোপের পিছন দিয়ে ওদিকে দৌড়ে পালাল।

বদনা ?

হ্যাঁ, রাস্তার আলো মুখে পড়তে চিনতে পেরেছি। ও ব্যাটার আক্রোশ আছে আমাদেব ওপর। ওর ধাবণা আমরাই ওর অন্ন কেড়ে নিয়েছি।

মালতী আর একটি কথাও বলল না। আঁচলটা খুলে রাস্তাব কলের দিকে এগিয়ে গেল।

ভাগ্য ভালো। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন বিশেষ নেই। দু-এক জন যা পথ চলছে তাবা জোর পায়ে বাড়ির দিকে রওনা হবার জন্য ব্যস্ত। কাব গায়ে কে কি ছুঁড়ল সে দিকে নজর দেবার সময় নেই।

পবের দিন মেদিনী পাঁজা কাফেতে ঢুকতেই মালতী গিয়ে দাঁড়াল।

গণেশের ছবির দিকে মুখ ফিরিয়ে পাঁজা সবে নমস্কাব শুরু করেছে, মালতীকে দেখে ইসাবায় জিজ্ঞাসা করল, ভ্রূ নাচিয়ে, কি ব্যাপার ?

মালতীও হাত নেড়ে ইশাবায় উত্তর দিল, হবে অখন। আপনি নমস্কার সেরে নিন।

নমস্কার সেরে পাঁজা ঘুরে বসল, কি ব্যাপার মা লক্ষ্মী ?

এই একটি বিশেষ গুণ পাঁজার। খদ্দেরের কাছে একেবারে বিনয়ের অবতার। মালতী চাঁপার কাছেও কখনও কড়া স্বর নয়,

মোলায়েম গলা। দেনা-পাওনা সম্বন্ধে কড়া, একটি বাড়তি পয়সা উপুড়হস্ত করার নাম নেই, তবে মাসের শেষে মাইনের টাকা ঠিক মিটিয়ে দেয়। অবশ্য একেবারে ছাড়িয়ে দেবার দিন বদনের মতন ব্যবহার করবে কি-না ভগবান জানেন!

সবিস্তারে মালতী সব বলল। কিছুটা রং চড়িয়ে।

শুনে পাঁজা স্তম্ভিত। অনেকক্ষণ পরে কেবল বলল, বদনা হারামজাদার মরণ বাড় বেড়েছে দেখছি। দাঁড়াও ওকে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করছি।

ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা পাঁজা কি করল মালতীরা টের পেল না, কিন্তু কোন গোলমাল নেই। পার্কের কাছে মালতী আর চাঁপা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করে, জোর গলায় হাসে, কিন্তু কোথাও কিছু নেই। পার্কের একটি ঝোপও নড়ে না। জনমানবের চিহ্নও নেই।

কি ব্যাপার চাঁপাদি, বদনার জারিজুরি সব ফাঁক।

ওই যে সেদিন আমি দেখে ফেলেছি, তাইতেই ভয় পেয়েছে। বুঝতে পেরেছে তো পাঁজাব কানে আমরা কথাটা তুলব।

মজার কাণ্ড দেখ, মালতী বলে, ঝগড়া পাঁজার সঙ্গে। আমরা তোর কি করলাম। আমাদের ওপর এ অত্যাচার কেন। বললে বিশ্বাস করবে না চাঁপাদি অতবার কাচার পরেও শাড়ীটা পরতে কেমন গা ঘিন ঘিন করে। কত বছরের জমানো গোবর কে জানে।

ছোট ছেলে হোঁচট খেলে চৌকাঠকে মারে তো, বদনারও হয়েছে সেই দশা। একদিন সামনা সামনি যদি পাই একটি চড়ে ওর দাঁতের মাড়ি আমি ঢিলে করে দেব।

মালতী চেয়ে চেয়ে দেখল। তা চাঁপা পারে। আঁট-সাঁট গড়ন। অভাবেও বাড়তি মাংস একটু ঝরে নি। বদনকে তেমন ভাবে বাগিয়ে ধরতে পারলে তার রক্ষা নেই।

মাসখানেকের ওপর কেটে গেল। কোন গোলমাল নেই। একদিন মালতীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছিল বদনের। মিনিট কয়েকের জন্য। রাস্তায় বাঁদর নাচ হচ্ছিল। শরীরটা একটু খারাপ বলে মালতী তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছিল। একবার উঁকি দিতেই, বাঁদর নয়, বদনকে চোখে পড়ল। আরো যেন শীর্ণ হয়ে গেছে চেহারা। উঁচু চোয়ালে আর কোটরগত দুটি চোখে অর্ধাহারের ছায়া। খালি গা, পরনের প্যাণ্টের অবস্থা শোচনীয়।

চোখাচোখি হতেই বদন চট করে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেল।

মালতী অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। চুপচাপ। এখনও বোধহয় বদনের কিছু হয় নি। চট করে যে কিছু হবে এমন ভরসাও কম। দিনকাল ক্রমেই মন্দের দিকে। আগে যে সব খদ্দেররা দু-আনা চার আনা বকশিশ দিত, আজকাল এক আনা দিতেও তারা যেন কেমন বিব্রত বোধ করে। অনেকে তো ওসব পাট একেবারে চুকিয়েই দিয়েছে। কোন রকমে প্লেটের ওপর বিলের পয়সা ফেলেই সরে পড়ে। মুখ তুলে মালতী-চাঁপার দিকে চায়ও না একবার।

কিন্তু চাকরি-বাকরি নেই বলে যত অত্যাচার বুঝি চাঁপা আর মালতীর ওপর। সাধ্যি যদি থাকে তো মুখোমুখি পাঁজার সঙ্গে লড় না। যে তোর আড়াই টাকা আটকে রেখেছে।

মাঝে মাঝে পাঁজা জিজ্ঞাসাও করে, কিগো মা লক্ষ্মীরা, বদনা ব্যাটা আর বদমায়েশি করে ?

মালতী ঘাড় নাড়ে, না। আর করে না কিছু।

চাঁপা প্রশ্ন করে, কি ওষুধ দিলেন বলুন তো। বাছাধন একেবারে ঠাণ্ডা।

ওষুধ আর কি, পাঁজা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসে, আবদুলকে বলে দিয়েছিলাম তোমাদের যাবার সময় পার্কের কাছে

থাকতে। বদনা ব্যাটা আবতুলকে খুব চেনে কি-না। তু-এক বার রদ্দা খেয়েছে, তাই আর ধারে কাছে ঘেঁষে না।

কথা শেষ করে পাঁজা অনেকক্ষণ ধরে হাসে, তারপর হঠাৎ বাইরের দিকে চেয়ে মোলায়েম গলায় বলে, আসুন দাদা, গরীবের দোকানে একবার পায়ের ধুলো দিন। সব টাটকা জিনিস পাবেন।

চাঁপা আজকাল প্রায়ই কামাই করতে শুরু করেছে। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন আসেই না। কারণটা মালতীর একেবারে অজানাও নয়। মাস চারেক ধরে একটি ছিপছিপে কালো ছোকরা দোকানে আসছে। হাতে বেহালার বাক্স। চাঁপার কাছ থেকে কাপ ডিশ নেবার সময় আঙুলে আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি। অকারণেই মুখের রং বদলাত তুজনের। পর্দার আড়ালে ফিসফাস কথাবার্তা। শুধু জিনিস অর্ডার দেওয়ার ব্যাপারই নয়, সেটুকু বোঝবার মতন বুদ্ধি মালতীর আছে। বখশিশের বদলে সস্তা মিনে-করা আংটি, ঝিনুকের প্রজাপতি, সেণ্টের ছোট শিশি। এসব চাঁপাই মালতীকে দেখিয়েছে। কোন্ এক গেঞ্জির কলে ছোকরা খাতা লেখে। মাস তুয়েকের মধ্যেই চাঁপাকে ঘরে তুলবে। আর তাকে দোকানে কাজ করতে দেবে না।

কথাটা পাঁজার কানেও উঠেছে। তু-এক জন মেয়ে দোকানে আসছে। দেখা করছে পাঁজার সঙ্গে। তাদের মধ্যে থেকেই একজনকে চাঁপার বদলি নেওয়া হবে। কাজেই ফেরার সময় মালতী একলাই ফেরে। দরকার হলে পার্কের মাঝখান দিয়েই চলে আসে। একটু অন্ধকার, কিন্তু পথ কিছু কম হয়।

সেদিন পার্কের মাঝামাঝি আসতেই থেমে গেল। অনেক দূর থেকে একটা হৈ চৈ চিৎকার। কেউ বুঝি গাড়িচাপা পড়ল, না অতর্কিতে কারুর পিঠে কেউ ছোরাই বসিয়ে দিলে। গোলমাল ক্রমেই যেন এগিয়ে আসছে।

মালতী বিলিতি সুপারি গাছের গুঁড়ি ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। আওয়াজ আরো কাছে। অনেকগুলো লোকের মিলিত পায়ের শব্দ।

'চোর, চোর, পকেটমার।'

মালতী রেলিংয়ের কাছ বরাবর আসার আগেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। কে একজন ছুটে যেতে গিয়েই লোহার রেলিংয়ে পা আটকে ছিটকে পড়ল মালতীর পায়ের কাছে।

ওঠবার চেষ্টা করার আগেই মালতী ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। ভয়ই বা কি। রাস্তাব এপারে অন্তত জনপঞ্চাশেক লোক এসে জুটেছে। হাতে ছোরা ছুরি থাকলেও ব্যবহাব করতে পারবে এমন ভরসা কম। মুখ গুঁজড়ে পার্কের ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। মুখটা তুলে ধরতেই মালতী পিছিয়ে এল। বদন। গ্যাসের আলোয় চিনতে কোন অসুবিধা হল না।

বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। বদন ফিস ফিস করে চেঁচিয়ে উঠেই থেমে গেল। গ্যাসেব আলোয় সেও মালতীকে চিনে ফেলেছে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে মালতী টেনে তুলল বদনকে। অনেক দিনের জমানো আক্রোশে গায়েব শক্তিও যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। চাঁপা নাই থাক, মালতী একাই একশ। তাছাড়া জনতা আবো কাছে এসে পড়েছে। বদনকে পেলে বোধহয় ছিঁড়েই ফেলবে।

ভগবান আছেন। আজ তোকে হাতের মুঠোব মধ্যে পেয়েছি। পচা গোবর, কাদা জল ছিটোনো সে সব এত শিগ্গিব ভুলে গেছি মনে করেছিস ?

দু-হাতে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলতে গিয়েই মালতী থেমে গেল। বিস্ফারিত দুটি চোখের তারা। পাংশু, রক্তহীন মুখ, দুটি ঠোঁট থরথরিয়ে কাঁপছে।

মালতীর মুঠো আলগা হয়ে গেল। সব জোর যেন সে হারিয়ে

ফেলেছে, সব আক্রোশ নিশ্চিহ্ন। ঠিক এমনি চোখের চাউনি, এমনি শঙ্কাচ্ছন্ন মুখের ভাব, এমনি নিরক্ত দুটি ঠোঁট।

অনেক অনেক দিন আগে। তখন কত আর বয়স মালতীর। বড় জোর দশ কি বারো। তারকের বয়স আরো কম। বছর সাতেকের বেশী নয়। মালতীর ছোট ভাই তারক। দুজনে একসঙ্গে নেমেছিল খিড়কির পুকুরে। রোজকার মতন। তারককে মালতীই সাঁতার শিখিয়েছিল। খুব ছোট বেলা থেকে।

খেয়াল নেই সাঁতার কাটতে কাটতে দুজনে প্রায় পুকুরের মাঝ-বরাবর। হঠাৎ তারক চেঁচিয়ে উঠল, দিদি আমায় পায়ে কি জড়িয়ে গেছে রে। পা নাড়তে পারছি না। ঝাঁঝি আর দামে পুকুর বোঝাই! কোন রকমে পায়ে জড়ালেই সর্বনাশ। ক্রমেই অবশ করে দেয়। পা ছোঁড়ার জোর থাকে না।

মালতী তারককে ধরে আস্তে আস্তে সাঁতার কাটতে লাগল। তীরের দিকে। কিন্তু তারকই বিপদ বাঁধাল। ভয় পেয়ে চিৎকার করে দিদির চুলের গোছা আঁকড়ে ধরল। বজ্র মুষ্টিতে। তারককে বাঁচানো দূরে থাক, মালতী নিজেই ক্রমে তলিয়ে যেতে লাগল। অনেক অনুনয়, মিনতি করল তারককে।

ছাড়, ছাড় তারক, নইলে দুজনেই ডুবব।

তারকের কোন চেতনা নেই। আরো শক্ত করে চুলের গোছা আঁকড়ে ধরল। বার দুয়েক তলিয়ে বহুকষ্টে মালতী জলের ওপর ভাসার চেষ্টা করল। কোন উপায় নেই। তারক নিজেও মরবে তাকেও মারবে। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে মালতী তারকের দুটো হাত মচকে দিল। ছাড়িয়ে নিল চুলের গোছা। তলিয়ে যাওয়ার আগে এক মুহূর্তের জন্য মালতী তারকের মুখের দিকে চোখ ফেরাল।

কোন তফাত নেই। ঠিক আজকের বদনের মতন। ডুবে

যাবার আগে ঠিক এমনি অসহায় কাকুতি ফুটে উঠেছিল তারকের মুখে।

এ কথা কেউ জানে না। সকলেই মনে করেছিল হঠাৎ গভীর জলে গিয়ে পড়ে আর পাড়ে আসতে পারে নি তারক। মালতী একথা কাউকে বলে নি। বলার মতন সাহসও তার ছিল না।

সেদিন ভাইকে দু-হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল অথৈ জলে, আজ কিন্তু মালতী সে ভুল আর করবে না।

চট করে বদনের হাত থেকে চোরাই মনিব্যাগটা তুলে নিয়ে মালতী নিজের ব্লাউজের ফাঁকে ফেলে দিল। তারপর সস্নেহে বদনকে তুলে ধরে বলল, তুমি যেন তোমার দিদিকে কাফে থেকে নিয়ে যেতে এসেছ, কেমন? চল আমার সঙ্গে সঙ্গে, কোন ভয় নেই। আমরা এ পাশের গেট দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সোজা বাড়ি চল আমাদের, পায়ে একটু চুন হলুদ গরম করে লাগিয়ে দেব।

বদন পরম নির্ভরতায় পচা গোবর আর কাদা ছিটিয়ে দেওয়া হাতে মালতীর একটা হাত আঁকড়ে ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করল। কোনদিকে না চেয়ে।

॥ অভিসারিকা ॥

মুখের ওপর রোদ এসে পড়তেই পান্না সুরেখার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আলস্যভরা চোখ মেলে এদিক ওদিক দেখল। প্রথমে দেয়াল ঘড়ির দিকে, তারপর পাশের খাটের ওপর।

বিছানা খালি। অবশ্য বেলা সাড়ে সাতটার সময় মানুষটার থাকবার কথাও নয়। এতক্ষণ পাক দিচ্ছে মেমোরিয়াল-ময়দানে কিংবা হয়তো গাড়িতে বসে দাঁতন করছে।

পান্নাকে অনেক সাধাসাধি করেছে। কি আর অসুবিধা। ঢাকা গাড়িতে চেপে সোজা ময়দান, তারপর নেমে পড়ে শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটা।

উপকারও অনেক। পেটে গ্যাস হবে না, বদ হজম নয়, ডায়বেটিসের সুঁই নিতে হবে না রোজ, তাছাড়া আঁখ ভাল হবে।

পান্না হেসেছে। তার শরীরে কোন গোলমাল নেই। না বদহজম না বদহাওয়া। আর আঁখ ?

দেয়ালে টাঙানো বিরাট আয়নার সামনে গিয়ে পান্না দাঁড়িয়েছে। বিলোল কটাক্ষ হেনে বৈজনাথের দিকে ফিরে বলেছে, কেন, আমার আঁখ কি খারাপ ? কোন দোষ দেখতে পাচ্ছ ? আঁখ ঠিক করতে ও রকম ভেজা ময়দানে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে কিসের জন্য ?

শেয়ার মার্কেটের ঝানু দালাল বৈজনাথ সুরেখা অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারে নি। চাঁদির তেজী-মন্দী বোঝে, পাটের ওঠানামা, কিন্তু টানা কাজল চোখের মায়া তার আওতার বাইরে। বোঝে না, বোঝবার চেষ্টাও করে না।

হেসে বলেছে, এখন উমর কম, সবই ঠিক আছে। কিন্তু এর পর ?

ভ্রূ কুঁচকে পান্না বলেছে, কি এরপর ? আমার উমর বাড়বে না, আমি কোন দিনই বুড়ো হব না। চিরটা কাল ঠিক এই রকমই থাকব।

বৈজনাথ আর কথা বাড়ায় নি। পান্নাকে কিছু বলেও লাভ নেই। বললেও হেসে উড়িয়ে দেবে।

হলুদ পাগড়ির প্যাঁচটা মাথায় শক্ত করে বাঁধতে বাঁধতে বৈজনাথ বেরিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু লঘু সুরে কথাগুলো বললেও পান্না রীতিমত ভয়ই পেয়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই অমনি অবস্থা হবে। বৈজনাথের আগের চেহারা পান্নার বেশ মনে আছে। উটের পিঠে চেপে বিয়ে করতে এসেছিল ছিপছিপে ফর্শা রঙের ছোকরা। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। পান্না ওর দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার। বয়সের তফাত দুজনের বেশ। বিয়ের সময় পান্নার বয়স বছর পনেরো।

তারপর এই ক বছরেই বৈজনাথ বদলে গেল। বাড়ি হল, চাঁদির চাক্তি বাড়ল, পান্নারও গয়না হল, সেই সঙ্গে মেদ বৃদ্ধি হল বৈজনাথের। গালের মাংস ফুলে ফেঁপে চোখ আর নাক প্রায় ঢেকে দিল। উদরের পরিধি জালাসদৃশ। এমনি বিরল কেশ ছিলই, এবার মোহরের মাপের টাক ফুটে উঠল। চলতে ফিরতে হাঁপানী, একটু পরিশ্রমেই স্বেদের ফোয়ারা। মাংসের চাপে হার্টের হাল সঙ্গীন।

আগে এক খাটে পাশাপাশি শুত দুজনে। পান্না আর বৈজনাথ। কিন্তু ইদানিং তা আর হবার উপায় নেই। সারা খাট জুড়ে বৈজনাথের দেহ। পাশে এক চিলতে যে জায়গাটুকু বাকি থাকে, তাতে পান্না কোন রকমে ভয়ে ভয়ে শুত। মাঝরাতে

আচমকা যদি পাশ ফেরে বৈজনাথ, তাহলে পান্নাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে চিঁড়ে চ্যাপটা।

অনেক ভেবেচিন্তে আলাদা বন্দোবস্ত হয়েছে। বৈজনাথও হাত-পা ছড়িয়ে শুতে পারবে, পান্নাও নির্ভাবনা। প্রাণ হাতে করে রাত কাটাতে হবে না।

এ চেহারা বৈজনাথেব নিজের তৈবি। কাউকে দোষ দিতে পারবে না। বেলা এগারোটায় শেয়ার মার্কেটে গিয়ে বসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে। ওঠা-হাঁটাব নাম নেই। একটু মেহনত নয়। কেবল মাঝে মাঝে গলার কসবত। বাড়িতে ফিবেও গাদা-গাদা কাগজের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে। দুনিয়ার কোন্ বাজারে কি ডিগবাজি খেল, কোথায ধাপে ধাপে ইজিপ্সিয়ান সুতোব দর চড়ল, কিংবা কাত হল দস্তার দাম রাত বাবোটা পর্যন্ত তাব খবরদাবি। তাতেও নিষ্কৃতি নেই। মাঝে মঝে আচমুকা ঘুম ভেঙে পান্না হাতড়ে হাতড়ে খুঁজেছে। না, মানুষটা বিছানায় নেই। উঠে বসতেই নজরে পড়েছে। টেলিফোন সামনে নিয়ে চেয়াবে বসে বসে ঢুলছে।

কি, সারা বাত ওভাবে বসে থাকবে নাকি ?

না, না, সাবা রাত কেন, বৈজনাথ বিব্রত গলায় আমতা আমতা কবছে। চেয়ার ঘুরিযে পান্নার দিকে ফিরে বলেছে, এই আব ঘণ্টা দুয়েক, তার মধ্যেই পেয়ে যাব।

কথার ভঙ্গীতে মনে হল আর ঘণ্টা দুয়েকেব মধ্যে বৈজনাথ বুঝি মোক্ষই পেয়ে যাবে।

কি পাবে কি ? পান্না খিঁচিয়ে উঠেছে।

বুলাকিদাস মানুভাইযেব টেলিফোন কলটা। কানাডার বাজাবেব মোক্ষম খবর। আজ রাতে খবরটা পেলে কাল সকালেই একটা ওলট-পালট শুরু হবে, এখানকাব বাজাবে।

অন্ধকাবে বৈজনাথেব মুখটা আবছা দেখা গেল। জানালার

খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে রাস্তার আলোর কিছুটা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। সব অস্পষ্ট। ছায়া-ছায়া।

পান্না আর কথা বাড়াল না। ঠোঁট কুঁচকে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আশ্চর্য মানুষ! আজ বলে নয়, চিরকাল। আগে তবু মন বলে একটা পদার্থ ছিল, মাঝে মাঝে পান্নার সঙ্গে হালকা কথাবার্তা দু-একটা বলত, কিন্তু আজকাল একেবারে বদলে গেছে। সোনা-চাঁদির বার আর শেয়ার স্ক্রিপের চাপে সে মন থেঁতলে গেছে। সে মানুষ নিশ্চিহ্ন।

চোখ বন্ধ করে পান্না শুয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু ঘুম আসে নি। আবোল-তাবোল চিন্তা, এলোমেলো ভাবনার জট, হারিয়ে-যাওয়া কথার টুকরো। প্রায় সারাটা রাত পান্না বিছানায় ছটফট করেছিল।

মনে পড়ল পান্নার। পূর্ণিমার রাত। চাঁদের আলোয় ভেসে গেছে ঘর আর বারান্দা। পানমল কোঠারির বাড়ির ছাদের ওপর নিটোল, রুপো-রঙা চাঁদ। চেয়ারটা বাইরে টেনে নিয়ে পান্না বসেছিল, দিনের কাজ শেষ করে বৈজনাথ পিছনে এসে দাঁড়াল।

ইস, খুব জোর আলো তো!

কি ভাগ্যি চাঁদের। বৈজনাথ হাতের কাগজ টেবিলে আছড়ে রেখে চাঁদের দিকে চোখ ফেরাল।

হবে না, আজ যে পূর্ণিমা। এক কলা করে বেড়ে বেড়ে আজ চাঁদ ষোলোকলায় পূর্ণ। কাল থেকে আবার কমতে আরম্ভ করবে।

পান্না খুব আস্তে আস্তে কথাগুলো বলল। ওর মন সুরমল লোহিয়া লেন পার হয়ে লোয়ার চিৎপুর রোডের এলাকা ছেড়ে কিষাণগড়ের এক পল্লীর প্রান্তে পৌঁছে গেছে। চারদিকে মরু-প্রান্তর। বালির স্তূপ। ওপরে মেঘহীন আকাশ আর আকাশে আজকের রাতের মতন এমনি পরিপূর্ণ চাঁদ।

চমক ভাঙল বৈজনাথের উচ্চহাস্যে।

ঠিক বলেছ, একেবারে বিলকুল ঠিক। শুধু চাঁদ কেন, সারা দুনিয়া জুড়ে এই তেজী-মন্দীর খেলা। আজ বাড়ছে, কাল কমছে। দু-আনা কমল তো কিনে রাখ হাজার খানেক, তেজীর বাজারে ছেড়ে দাও। চাঁদের চেয়েও দামী চাঁদি পকেটে চলে আসবে।

পান্না চেয়ার ছেড়ে উঠে ভিতরে চলে এল। এরপর আর সে চাঁদের দিকে চাইতে পারবে না। চাইলেও চাঁদের কি রূপ চোখে পড়বে কে জানে! হয়তো বৈজনাথ চেঁচিয়েই উঠবে। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই, কাল থেকে যদি কমেই যায় চাঁদ, তো এই বেলা বিক্রি করে ফেলাই সমীচীন। ভাল দাম পাওয়া যাবে।

কিন্তু একদিন সব গোলমাল হয়ে গেল।

অফিসের কাজ শেষ করে মোটরে ওঠবার মুখেই মাথাটা ঘুরে উঠল। ড্রাইভার ধরে না ফেললে হয়তো বৈজনাথ পড়েই যেত মুখ থুবড়ে। গদিতে হেলান দিয়ে বৈজনাথ ক্লান্ত গলায় বলল, বিবেকানন্দ রোড।

এইটুকুতে ড্রাইভার ঠিক বুঝে নিল। বিবেকানন্দ রোড মানে ডাক্তার সেনের ফার্মেসী। নর্দার্ন ক্লিনিক।

ডাক্তার সেন আধ ঘণ্টা ধরে দেখলেন। বুকে পিঠে কল বসিয়ে। হাতে কাল কাপড় জড়িয়ে যন্ত্র টিপে টিপে। জিভ, চোখের কোণ। শিরা ফুঁড়ে রক্তও নিলেন খানিকটা, ইউরিন নিলেন, তারপর গম্ভীর গলায় বৈজনাথের দিকে ফিরে বললেন, আপনাকে বিশ্রাম নিতে হবে। কিছুদিন একেবারে পুরো আরাম, তারপর থেকে খাটুনির মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে।

বৈজনাথ কোন কথা বলল না। কেবল জলে-ডোবা মানুষের মতন অসহায় দুটি চোখ তুলে ডাক্তার সেনের দিকে চেয়ে রইল।

নিজের কারবার, ছুটি নেওয়ার তো হাঙ্গামা নেই। কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসুন, বুঝলেন ?

বৈজনাথ কিছু বুঝল না। কথাগুলো আদৌ কানে গেল কি না কে জানে!

বৈজনাথের মনে পড়ল কপার কেনা আছে পাঁচ হাজার, স্টিল হাজার দুয়েক, তার ওপর বিশপ কোম্পানি দেড় হাজারের মতন। এ ছাড়া ছোটখাটো শেয়ার অগুনতি। এ সপ্তাহের মধ্যেই একটা ওলোট-পালোট হওয়ার সম্ভাবনা। বোম্বাইয়ের জবর খবর আছে। এখন কখনো অফিস কামাই করা চলে! পরের অফিস হলে কথা ছিল, কিন্তু নিজের অফিসে না গেলেই ক্ষতি। মোটা টাকা লোকসান হয়ে যাবে। কাববারে নিজের লোক বলতে এক ভাতিজা সম্বল। কিন্তু তার মতিগতি মোটেই সুবিধার নয়। একটু ফাঁক পেলেই সরে পড়ে। হয় হোটেলে, নয় ঘোড়দৌড়ের মাঠে। তাছাড়া সাজপোশাকের বাহাবই বা কি! যে কারবারীর ধুতির ঝুল হাঁটু ছাড়ায়, তার কারবার লাটে উঠতে মোটেই দেবি হয় না। গন্ধ তেল মেখে চুল ওল্টানো মানেই গণেশ ওল্টানো।

বৈজনাথ অনেক বুঝিয়েছে। তাব ছেলে নেই--পুলে নেই। চোখ বুজলে সবই ভাতিজার। সমঝে চললে দু পুরুষ বসে খেতে পারবে। পুরুষোত্তম সুরেখা ঘাড় হেঁট করে কথামৃত পান করেছে। ভাবভঙ্গী দেখে বৈজনাথ ভেবেছে রত্নাকবেব বাল্মীকি হবার আর দেবি নেই। কিন্তু রাত ভোর হতে যে কে সেই। ইয়ারবক্সী নিয়ে ফূর্তি ফাজলামী। খেয়াল শুনে বাত কাটানোর বদখেয়াল।

কিন্তু এত কথা তো আর ডাক্তার সেনকে বলা যায় না, তাই বৈজনাথ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, বেমারীটা কি ?

বেমারী ? ডাক্তার সেন গলা থেকে স্টেথস্কোপেব মালাটা

খুলে হাতে জড়ালেন, মানে রক্তের চাপ একটু বেড়েছে মনে হচ্ছে। কাল রক্তের রিপোর্টটা পেলে ঠিক ঠিক সব জানতে পারব। আজ রাতে আর কিছু খাবেন না।

বিলকুল উপোস? বৈজনাথ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

খুব খিদে পেলে ছানা কিংবা হালকা কিছু খাবেন।

হাতে-হাতে টাকা দেবার দরকার নেই। মাসকাবারী বন্দোবস্ত আছে। হিসেব করে চেক পাঠালেই চলবে।

গাড়ির গদিতে হেলান দিয়েই বৈজনাথ মুখ খুলল। ডাক্তার সেনের বাপান্ত। আজকালকার ডাক্তাররা কিছু জানে না। কেবল ভড়ং। ঝকঝকে তকতকে ফার্মেসী, ধোপদুরস্ত পোশাক আর দাঁত ভাঙা কতকগুলো রোগের নাম, ব্যস, পশার জমে ওঠে। হুজুগে মানুষের তো আর অভাব নেই।

বারোখানা ঘি-জবজবে রুটি, ভাজি, প্যাঁড়া আর রাবড়ী এই ছেড়ে শুধু ছানা—আবার মাথা ঘুরে পড়ার বন্দোবস্ত।

কিন্তু পরের দিন বিকেলে ব্যাপারটা ঘুরে গেল। সন্ধ্যার পর ডাক্তার সেন নিজে এলেন রক্তের রিপোর্ট নিয়ে। রক্তের রিপোর্ট সামনে নিয়ে গম্ভীর গলায় যা বললেন, তাতে বৈজনাথের রক্ত জল।

ব্লাডসুগার চারশোর ওপর। ইউরিনেও এ্যাসিটোন রয়েছে, এইবেলা সাবধান না হলে সমূহ বিপদ।

পর্দার ওপারে পান্না দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তারের কথাগুলো মন দিয়ে শুনল, তারপর সিঁড়িতে ডাক্তারের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই বৈজনাথের মুখোমুখি দাঁড়াল।

ডাক্তারসাব যা বলে গেলেন, সব আমি শুনেছি। তোমায় খাওয়া কমাতে হবে।

খাওয়া কমাতে হবে? ডাক্তারের কথাবার্তায় বৈজনাথ একটু বে-কায়দায় পড়েছিল, পান্নার কথায় একেবারে চুপসে গেল।

হ্যাঁ, এ বেমারী আমার পিতাজীর ছিল। আমি জানি। শঙ্কর

একেবারে বন্ধ। রোজ সকালে সুঁই নিতে হবে। তার জন্য ডাক্তার ডাকবার দরকার নেই। আমি বাবাকে দিতাম, সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। শুধু কাউকে দিয়ে ওষুধ আর সিরিঞ্জ আনিয়ে নিতে হবে।

এত কথা বৈজনাথের কানে গেল না। শক্কর বন্ধ! রোজ এক সের রাবড়ী আর গোটা ছয়েক গুলাবী প্যাঁড়া না মুখে দিলে বৈজনাথের তবিয়তই ঠিক থাকে না। দিল খিঁচড়ে যায়।

ডাক্তারের সব কথায় কান দিলে কখনো চলে? বৈজনাথ পান্নাকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু পান্না মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, না, ডাক্তারের কথায় কান দেব কেন, কান দেব তোমার বোম্বাইয়ের বুলাকিদাস মানুভাইয়ের কথায়। আজ থেকে মিষ্টি জিনিস তোমার একেবারে বাদ। মিষ্টি কিছুর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। ওরই মধ্যে পান্না গলার আওয়াজ একটু মোলায়েম করল। মুচকি হেসে বলল, অবশ্য কেবল আমার মিষ্টি কথা শোনা ছাড়া।

সেই থেকে খাওয়া-দাওয়ার কড়াকড়ি। প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধা হত বৈজনাথের। কাজকারবারে মন লাগত না। যেতে যেতে মোটর থামিয়ে মিষ্টির দোকানের সামনে চুপচাপ বসে থাকত। কাঁচের কেসের মধ্যে থাকে-থাকে-সাজানো মেঠাইগুলো দুটো চোখ দিয়ে লেহন করত। মাঝে মাঝে অফিস থেকে বেরিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ত। এদিক ওদিক চেয়ে একেবারে পর্দাঢাকা কামরার মধ্যে। খাওয়া-দাওয়া সেরে গোঁফ মুছে বেরিয়ে আসত ভালমানুষের মতন।

কিন্তু এ ত আর বেশী দিন চলল না। বাদ সাধল ওই ভাতিজা। অদৃষ্ট। দলবল নিয়ে সে যে ঐ দোকানেই ঢুকবে তা কি বৈজনাথ ঘুণাক্ষরে টের পেয়েছিল।

বৈজনাথের পাগড়ির খানিকটা পর্দার পাশ থেকে দেখা

যাচ্ছিল। গোঁফ দেখে বেড়াল চেনার মতন, পাগড়ি দেখে চাচাজীকে পুরুষোত্তম ঠিক চিনে ফেলল।

সবে বৈজনাথ হালুয়াসান শেষ করে ক্ষীরের লাড্ডু ভাঙতে যাচ্ছিল, এমন সময় পুরুষোত্তম উঁকি দিল।

চাচাজী!

সেই মুহূর্তে পুরুষোত্তম যদি কারবার নিজের নামে লিখিয়ে নেবার চেষ্টা করত, বৈজনাথ বোধ হয় বাধা দিত না। কিন্তু পুরুষোত্তম সেদিক দিয়ে গেল না। কেবল বলল, তোমার না এসব খাওয়া বারণ?

তর্ক করল না বৈজনাথ। বলল না, জোয়ান ছোকরার রাতভর বাঈজীর গান শোনাও তো বারণ, ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে পা বাড়ানোও তো অনুচিত। তবে?

বৈজনাথ এক হাত দিয়ে ক্ষীরের লাড্ডুটা সরিয়ে রেখে আর-এক হাতে পকেট থেকে করকরে একশ টাকার একটা নোট ভাতিজার দিকে প্রসারিত করে দিল।

হাত বাড়িয়ে নোটটা নিয়ে পুরুষোত্তম সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দোকান ছাড়ল।

বৈজনাথ নিশ্চিন্ত। কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই তার দুটো চোখ কপালের মাঝ-বরাবর।

পুরুষোত্তম নোটও নিয়েছে আবার চাচীকে ফোন করে সব বলেছে। নেমকহারাম পুরুষোত্তম। রাজপুত জাতের কলঙ্ক!

এসব অবশ্য অনেক আগের কথা। এখন বৈজনাথ অনেকটা ধাতস্থ। খাওয়া-দাওয়া গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। রোজ ভোরে ময়দানে পায়চারি, তারপর গঙ্গামায়ীতে নেমে অবগাহন স্নান।

ছুটিছাটার দিকে বৈজনাথ যায় নি। একটি দিনের জন্য কামাই নয়। বাড়িতে ফিরে এসেও নিস্তার নেই। পান্নার সঙ্গে সংসারের দু-একটা কথা বলেই কাগজের স্তূপ নিয়ে বসেছে। ছানার ছিটে

মুখে দিতে দিতে একমনে শেয়ার মার্কেটের হালচাল পড়েছে। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক টেলিফোন করে আরো পাকা খবর সংগ্রহ করেছে।

পান্নার অবস্থা মারাত্মক! সারাটা দিন আর কাটে না। তুজন চাকর, গোটা তিনেক পরিচারিকা। কাজেই নিজেকে কুটো ভেঙে তুখানা করতে হয় না। নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকে। কাকাতুয়াকে খাওয়ায় কিংবা পোষা বেড়ালকে আদর করে একটু। কিন্তু দিনের পর দিন কি আর এসব ভাল লাগে কারুর।

দামী শাড়ি আর জড়োয়া গহনা পরে বারান্দায় বসে থেকেছে। ভাল লাগে নি বেশীক্ষণ। কুড়ি ফিট চওড়া সড়ক। সাবসার মোষের গাড়ি, ঠেলাগাড়ি, মাঝে মাঝে অনববত হর্নবাজানো কয়েকটা মোটর। লাল, নীল, হলদে রংয়ের পাগড়ি মাথায় পুরুষের দল, বুক অবধি ঘোমটা-টানা মেয়ের পাল। দেখে দেখে পান্নার অরুচি।

মাঝে মাঝে মরিয়া হয়ে বৈজনাথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঝি চাকরের নজর বাঁচিয়ে বৈজনাথের কাঁধে হাত রেখে মোলায়েম সুরে বলেছে, গণেশ টকির খবর রাখ?

বৈজনাথ কাগজ থেকে মুখ তুলে পলকের জন্য পান্নার দিকে চেয়ে মুচকি হেসেছে, তা আব খবর রাখি না। এই কাজই তো করছি ত্রিশ বছর?

কি খবর রাখো?

কালকের বিকেলের খবর সতেরো টাকা চার আনা। তবে আর বিশেষ বাড়বে বলে মনে হয় না। এ বছর ডিভিডেণ্ড দেবে না। ম্যানেজিং এজেন্সিও হাত পালটাচ্ছে। কিছু কিনে থাক তো বেচে দাও এই বেলা। এরপর ধরে রাখলে লোকসান খাবে।

কথা শেষ করে বৈজনাথ বিজ্ঞজনোচিত হাসি ফোটাল মুখে।

পান্না অবাক।

কি বকছ তুমি মাথামুণ্ডু।

মানে?

মানে, কিসের খবর চাইছি?

কেন, গণেশ ইঞ্জিনীয়ারিং তো। খুব জানি।

আমার পোড়া কপাল! কপালে হাত চাপড়ে পান্না সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। আঁচল দিয়ে গলার ঘাম মুছতে মুছতে বলল, বলছিলাম গণেশ টকির কথা। সতী অনসূয়া হচ্ছে। খুব ভাল বই। চল না দেখে আসি।

আমি? সাপের গায়ে যেন হাত ঠেকেছে এমনিভাবে বৈজনাথ আঁতকে উঠল, আমার তো যাওয়া মুশকিল। আটটা থেকে দশটার মধ্যে একটা টেলিফোন আসবে। আমার বাড়ি ছাড়া চলবে না।

পান্না চুপ করে রইল।

আড় চোখে বৈজনাথ একবার চেয়ে দেখল, তারপর মিহি গলায় বলল, একটা কাজ কর না। মোহনকে নিয়ে তুমি চলে যাও না। এই তো কাছেই। লছমীকেও না হয় সঙ্গে নাও।

মোহন ড্রাইভার। লছমী ঝি। পান্না একটি কথাও না বলে চলে গেল। নিজের বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ।

হায়রে এই তার জীবন! দামী শাড়ি আর জড়োয়া গহনা, হুকুম করার মতন একগাদা দাসদাসী, না চাইতে খাবারের থালা এসে হাজির। একটা মানুষের বাঁচার পক্ষে তো যথেষ্ট। কিন্তু কতটুকু দাম এমন বাঁচার। মনকে উপোসী রেখে এ প্রাচুর্যের নিক্তিতে নিজেকে ওজন করে লাভ কতটুকু।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে পান্না এক

সময়ে উঠে পড়ল। চাঁদমল বাঁটিয়ার বাড়ির পোষা কোকিলটা অনবরত ডেকে চলেছে। আশ্চর্য! নুরমল লোহিয়া লেনে কোকিল থাকে আবার এমন করে ডাকেও।

দেরাজ খুলে পান্না রুপোর চুমকী-দেওয়া গোলাপী শাড়ি বের করল, সেই রংয়ের ব্লাউজও। সাজপোশাক শেষ করে বৈজনাথের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

তাহলে আমি ঘুরে আসি গণেশ টকিতে।

প্রথমে কথাটা বৈজনাথের কানে গেল না। একমনে কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি দেখছে। বোধ হয় নারানগঞ্জে নতুন খোলা পাটের এজেন্সির হিসেব।

পান্না আরো কয়েক পা এগিয়ে এল। আবার বলল কথাটা।

মুখ না তুলেই বৈজনাথ ঘাড় নাড়ল।

পান্না একলাই গেল। লছমীকে সঙ্গে নিল না। মোহনকে নির্দেশ দিয়ে গাড়িব পিছনেব সিটে হেলান দিয়ে বসল।

লোয়াব চিৎপুব বোড পার হতেই পান্না মত বদলাল। ভিড় অনেক ভদ্র। বয়েল-গাডি আব ঠেলাব ঝামেলা নেই। বঙীন নিওন আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। ফুরফুবে বাতাস। বসন্তেব আবাহনী।

সোজা চল ময়দান। সামনে ঝুঁকে পড়ে পান্না মোহনকে নতুন নির্দেশ দিল।

ময়দান অবধি অবশ্য তাকে আব পৌছতে হল না। ধর্মতলাব মোড়েই দেখা হয়ে গেল।

পান্না মুখ বাড়িয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল, হঠাৎ আলোর নিচে চোখ পড়তেই থেমে গেল। পরিচিত নয়, তবু মনে হল যেন যুগযুগান্তের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। দুর্নিবার আকর্ষণে পান্নাকে টানতে লাগল।

সঙ্গিনীদের কাছে কিছু কিছু পান্না শুনেছে। কোথায় দেখা পাওয়া সম্ভব সে কথাও তারা বলেছে। পান্না একলা কোন দিন এমনভাবে বের হয় নি। সাহস হয় নি। কিন্তু আজ চাঁদমল বাঁটিয়ার কোকিলটা সব ভয়, সব সঙ্কোচ, সব জড়তা ঘুচিয়ে দিয়েছে।

এদিক ওদিক পান্না চেয়ে চেয়ে দেখল। ধারে কাছে চেনা লোক নেই তো কেউ। মোটর থামিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলে হয় না। কি ক্ষতি! এমনভাবে পরিমিত জীবনযাত্রার সরু সড়ক ধরে কতদিন চলতে পারে মানুষ! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাপা কথাবার্তা, মাপা খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা তাও নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে।

ঘরের মানুষটার কথা মনে পড়ল। তার ইজ্জত ধুলোয় মিশবে, খসে পড়বে আভিজাত্যের মিনার!

তাই যদি কি হয়, কি করতে পারে পান্না! বার বার সেই কেবল সকলের কথা ভাববে এটাই বা কেন হবে! পান্নার দিকে কতটুকু দেখে বৈজনাথ? পান্নার দেহের দিকে নয়, তার মনের দিকে।

শাড়ি-গহনা পরল, দুবেলা খেল ভালমন্দ, ব্যস, এই পরিধির বাইরে আর কি দেখার আছে! পান্না তো সুখী। রাজস্থানের পল্লীপ্রান্ত থেকে আহরণ করে এনে তাকে শহরের সম্রাজ্ঞী করেছে, এই কি যথেষ্ট নয়।

কিন্তু পান্নার সাহস হল না। একদৃষ্টে চেয়ে থেকে থেকে আবার ফিসফিস করে মোহনকে বলল, গাড়ি ঘোরাও, বাড়ি যাব।

ভোরের দিকে পান্না মন ঠিক করে ফেলল।

নিজে সে বাঁচবে। তাতে কার কতটুকু ক্ষতি হবে তার দেখবার দরকার নেই। জানবারও নয়। বৈজনাথ সুরেখা যদি শেয়ার

মার্কেট আর পাটের কেনাবেচা নিয়ে জীবন কাটাতে চায়, ঠুলি-পরা ঘোড়ার মতন ব্যবসার খোয়া-বাঁধানো রাস্তা ছাড়া আর কোন দিকে দৃকপাত না করে, তবে পান্না সুরেখাও তার রুচিমাফিক চলবে। যেখানে ইচ্ছা যাবে, যা ইচ্ছা করবে।

কিন্তু নিজের ইচ্ছামত চলবার মুখেই পান্না বাধা পেল।

সকাল থেকে পান্না ঠিক করেছিল, সন্ধ্যার ঝোঁকে সে বেরিয়ে পড়বে। বৈজনাথ বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই। গাড়ি একটু দূরে দাঁড় করিয়ে নিজে হেঁটে হেঁটে যাবে। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াবে।

তবে সে যে থাকবেই তারও তো কোন স্থিরতা নেই। নাই যদি থাকে তো পান্নাকে পিছু হটে আবার ফিরে আসতে হবে গাড়িতে। মুখ টিপে হয়তো মোহন হাসবে।

কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি। নাচতে নেমে ঘোমটা টানার কোন মানে হয় ?

বৈজনাথ সুরেখার সামনে দিয়ে যেতেই পিছু ডাক।

আজ আবার কোথায় ?

ভাল লাগছে না বাড়িতে। একটু ঘুরে আসি।

কিন্তু আমি যে বেরোব এখনি। গুমনমলের ওখানে জরুরী একটা মিটিং আছে। আর বাড়ির বৌ তুমি, রোজ হুট হুট করে কোথায়ই বা যাবে।' মোহন বল্লে, কাল তো সিনেমাতেও যাও নি। পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছ।

আচমকা একটা ধাক্কা খেল পান্না। গোয়েন্দাগিরিও শুরু করেছে বৈজনাথ। চুপি চুপি ওর গতিবিধির খবর নিচ্ছে। ঠিক আছে। ও বেরোবে না। এতদিন যখন না বেরিয়ে চলেছে, আজও চলবে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে পান্না সশব্দে দরজা দুটো বন্ধ করে দিল। দামী

শাড়ি জামা ছেড়ে নিজের আটপৌরে পোশাক অঙ্গে জড়াল, তারপর উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পরই কথাটা পান্নার মনে এল।

সব সময় বৈজনাথ তো আর চোখে চোখে রাখতে পারবে না। তার কারবার আছে, মিটিং আছে, এদিক ওদিক ছোটাছুটি আছে। সেই ফাঁকে পান্না বেরিয়ে পড়বে। মোটর না জোটে ট্যাক্সিতে যাবে। লছমীকেও সঙ্গে নেবে।

কিন্তু এত সব ব্যাপারের পরে যার জন্য যাওয়া সেই যদি না থাকে। চঞ্চলমতি পুরুষের কথা বলা যায়! ঠাঁইবদল করলেই হল। পান্নার না হয় ওকে ছাড়া গতি নেই, কিন্তু কত পান্না ঘোরাফেরা করবে ওকে ঘিরে। নিজের চোখেই তো পান্না দেখেছে।

মতলব ঠিক করে পান্না উঠে পড়ল।

পাশ ফিরে হঠাৎ শুতে যাবার মুখেই পান্নার খেয়াল হল। আজ বুধবার। পাঁচটার পর বৈজনাথ সোজা যাবে চন্দনমলের গদিতে। দুজনে মিলে নতুন কারবারের পত্তন করছে, বুধবার তারই শলা-পরামর্শ। গাড়ি ফেরত পাঠায় বাড়িতে। চন্দনমল নিজের মোটর পাঠায় বৈজনাথ সুরেখাকে আনতে। কাজেই কোন অসুবিধা নেই। বাড়ির মোটরেই পান্না বেরোতে পারবে। প্রতি সপ্তাহে তাই বেরোচ্ছে। মোহনের মুখ বন্ধ। করকরে দুটো চাঁদির রুপেয়া হাতের মুঠোয় দিতেই সেলাম ঠুকেছে। একটি কথা বাবুর কানে যাবে না। মহাবীরের নামে শপথ নিয়েছে।

কথার খেলাপ করে নি মোহন। বৈজনাথ একটি কথাও জানতে পারে নি।

হয়তো সন্দেহ একটু করেছে। চালচলন একটু বদলে গেছে পান্নার। আগের মনমরা ভাব আর নেই। কথায় কথায় হাসি

কারণে অকারণে গানের কলি। বৈজনাথ একদৃষ্টে দেখছে। এত ফূর্তির উৎসটা কোথায় ? বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যৌবনের উদ্দামতা ফিরে এল কি করে।

ভয় ভয় করেছে পান্নার। বৈজনাথ কাছে এগিয়ে আসতেই ছলছুতো করে সে সরে গেছে। দ্রুতস্পন্দন বুকের মধ্যে। সন্ধানী চোখের দৃষ্টিতে বুঝি ধরা পড়ে যাবে পান্না। তাহলে লজ্জা লুকোতে গঙ্গামায়ীর বুকেই মুখ লুকোতে হবে।

বেলা পড়তেই পান্না সাজগোজ শুরু করল। ফিকে আসমানি শাড়ি, জরির বুটি দেওয়া, ঘাস-সবুজ ব্লাউজ। দু চোখের কোণে সুর্মা। আতর দান থেকে আতর বের করে কপালে, চোখের পাতায় ছিটোল। ঘোমটাটা আলতো হাতে টেনে দিল কপাল বরাবব।

দরজার সামনে মোটর তৈরী। সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে পান্না নামল। বৈজনাথ বাড়ি নেই, কাজেই কৈফিয়ত চাইবার লোকও নেই কেউ। তবু লজ্জা করে পান্নার। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলেই মুশকিলে পড়তে হবে। জানাজানি হলে বৈজনাথেব দিকে সারা জীবন বোধ হয় আর মুখ তুলে চাইতে পারবে না।

পান্না ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মোটব চলতে শুরু করল। পান্না একেবারে কোণেব দিকে গুটিসুটি হয়ে বসল। কি জানি, বলা যায় না, চেনা লোকের সঙ্গে যদি পথে ঘাটে চোখাচোখিই হয়ে যায়।

ভিড়ের যেন কামাই নেই। লোকগুলোও তেমনি তালকানা। একজন তো মোটরের তলায় পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। দোষ তার, কিন্তু তম্বি করতে ছাড়ল না। হাতের ছাতা উঁচিয়ে বীরবিক্রমে গালাগালি শুরু করল। মোটরের মালিকের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার। চিড়িয়াখানার প্রায় সব কটা জন্তুর নামে মোহনেব নতুন নামকরণ হল। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড। পান্না জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতেই লোকটা সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। রাস্তা পার হতে হতে

বার তিনেক ফিরে ফিরে দেখল পান্নার দিকে। আর-একটা মোটরের তলায় পড়তে পড়তে কোনরকমে বেঁচে গেল।

মোহন ঠিক জায়গায় মোটর থামাল।

নেমে কয়েক পা এগিয়েই পান্না থমকে দাঁড়াল। যার জন্য এত লুকোচুরি, এত বিপদ কাটিয়ে আসা, সে-ই নেই। এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে পান্না দেখল। ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মোটরে ফিরে যাবার মুখেই পান্নার নজরে পড়ে গেল।

ওই যে আসছে গুটি গুটি করে। যেখানে অপেক্ষা করার কথা সেখানেই এসে দাঁড়িয়েছে।

দ্রুত পায়ে পান্না এগিয়ে গেল। তার মুখোমুখি দাঁড়াল।

ধরা গলায় বলল, আমি অনেকক্ষণ এসে খুঁজছি তোমায়। ভাবলাম আজ বুঝি এলেই না।

লোকটি মৃদু হাসল, পুলিসের হাঙ্গামার জন্য অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছিলাম। আমার না এলে কখন চলে।

কথা শেষ করেই শালপাতার ঠোঙাটা এগিয়ে দিল পান্নার দিকে। বলল, নিন, আপনাকে দিয়েই আজ বউনি। খুব গরম আছে। দেখবেন, সাবধান।

সাগ্রহে অঞ্জলি পেতে পান্না শালপাতার ঠোঙাটা টেনে নিল। ফুচকাওয়ালার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলল, সত্যি বেশ গরম আছে। তেঁতুলের ঝোল আর একটু দাও তো। দেখ, যেন কাপড়ে না লাগে। দামী কাপড়।

॥ স্বাক্ষর ॥

সভা শেষ করে নামবার মুখেই বাধা পেলাম। সামনে অটোগ্রাফের খাতা খুলে একজন দাঁড়িয়ে। সভা শুরু হওয়ার আগে এক দফা সই করার পালা শেষ হয়েছে। মনে ভেবেছিলাম হাঙ্গামা বুঝি চুকে গেল।

অটোগ্রাফ-খাতাখানি হাতে নিয়ে চোখ তুলে চাইলাম, তারপর অনেকক্ষণ আর চোখ নামাতে পারলাম না।

কৈশোর যৌবন দুঁহু মিলে যাওয়ার বর্ণনা মৈথিলী কবিদের রচনায় পেয়েছি, কিন্তু যৌবন আর প্রৌঢ়ত্বের এমন সঙ্গম এর আগে আর চোখে পড়ে নি। চুলের ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা রূপালী ইশারা, কপালে বাড়তি কয়েকটা আঁচড়, এ ছাড়া সময় আর কোথাও স্পর্শ করতে পারে নি। কটাক্ষ আর ওষ্ঠাধরের বিন্যাসে আজও মুনিদের তপোভঙ্গের উপাদান।

একটু আশ্চর্য হলাম। এ বয়সে নামের মোহ কাটিয়ে বাংলা দেশের মেয়েরা নামাবলীর দিকে হাত বাড়ায়।

শুধু সই নয়, কিছু একটা লিখে দিন দয়া করে। গলার স্বরে কিশোরীর কমনীয়তা।

দেখি কার কার সই যোগাড় করেছেন? অটোগ্রাফ-খাতাটা হাতে নিয়ে ওল্টাতে লাগলাম। পরের সই দেখা অবশ্য আসল উদ্দেশ্য নয়, মনে মনে জুতসই দু-একটা লাইন ভাবতে লাগলাম কিংবা কোন মহাজনের মন-ভোলানো বাণী।

মহাজন থেকে দীনজন, কেউ আর বাদ নেই। গদ্য, পদ্য, গান সব আছে। গীতিকথার মাঝে মাঝে নীতিকথার ছিটে।

একটা পাতায় এসে থেমে পড়লাম। মহিলার দিকে চেয়ে বললাম, একি ?

মহিলা একটু বুঝি বিব্রত বোধ করলেন। মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বললেন, সই, কবি তাপস সেনের সই।

তাপস সেনের সই ? বিস্মিত হলাম।

তাপস সেনকে চিনতাম। এক সময়ে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। এক সঙ্গে এক কাগজে লেখা শুরু করেছিলাম। তাপস কবিতা, আমি গল্প।

একে কবিতা, তার উপর প্রকাশকদের মনোরঞ্জন করার মতন কিছু লিখতে তাপস নারাজ, কাজেই দু-একটা অভিজাত পত্রিকা আর নিকটতম বন্ধুবান্ধবদের গণ্ডী ছাড়িয়ে তার কবিতা জনগণের নাগাল পেল না। কিন্তু গোটা কয়েক কবিতা যা তাপস লিখেছিল, সত্যিকারের কাব্যরসিক মহলে বেশ হৈ-চৈ পড়েছিল সেগুলো নিয়ে। দু-এক জন অধ্যাপক পিঠ চাপড়েছিলেন তাপসের, সহপাঠীরা কিছু স্বীকৃতি কিছু ঈর্ষ্যামেশানো চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল। ওই পর্যন্ত।

সেই তাপস সেনের নাম মহিলার মুখে শুনে তাই খটকা লাগল।

কিন্তু একি সই ? মহিলার দিকে চোখ ফেরালাম।

এ ছাড়া আর কিছু দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ওইটুকুই জোগাড় করতে পেরেছিলাম।

তাপস সেনের কথা সবই আমার জানা।

ছিপছিপে চেহারার ফর্সা ছোকরা। বয়সের চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ দেখাত তাকে। বুড়ো বাপ, পঙ্গু মা, বিয়ের বয়স পার হয়ে যাওয়া দুটি বোন আর আরও দুটি অসহায় ভাই। সংসারের টলমলে পানসি ঠাসবোঝাই। ঐ সবই খরচের খাতায়, জমার

মধ্যে সম্বল তাপসের বি. এ. পাশের মামুলী সার্টিফিকেট আর কবিতা লেখার কলম।

অফিসের দরজায় দরজায় ঠোক্কর খেয়ে অতলে তলিয়ে যাবার মুখে তাপস টিউশনির কুটো আঁকড়ে ধরল। সকালে গোটা দুয়েক, দুপুরে একটা, রাত্রে আরও গোটা দুই। কিন্তু এ-সব চোরাবালির বেশী কিছু নয়। শক্ত মাটির আভাস নেই এতে। এর উপর নির্ভর করে কায়ক্লেশে দিনান্তের উপবাস বাঁচান যায়, কিন্তু সংসার বাঁচান যায় না।

ওরই মধ্যে সংসার একটু হাল্কা হল। বাপ বোধ হয় ছেলের মুখ চেয়েই ইহলোক ত্যাগ করলেন, একটি বোন রাতের অন্ধকারে ঘর ছাড়ল, কিন্তু তাতে সমস্যা মিটল না। ইতিমধ্যে ভাইরা আরও বড় হয়ে উঠেছে, তাদের খাওয়া-পরার প্রশ্ন আরও জটিল, মার পঙ্গুত্বও বেশ কায়েমী। শুধু মেঘের উপর মেঘই নয়, ঝড়ের ঝাপটাও প্রবল হয়ে উঠল। দুটো টিউশনি খতম, চেষ্টা করেও তাপস নতুন কিছু জোটাতে পারল না।

সেই সময়টা, আমরা, তার সাহিত্যিক সতীর্থরা তাকে এড়িয়ে যেতে লাগলাম। আগে ডেকে ডেকে তার কবিতা শুনতাম, কিন্তু এখন দুঃখের কাঁদুনি শোনার ভয়ে, পাশ কাটাতে শুরু করলাম। পাছে কিছু সাহায্য চেয়ে বসে, সেই ভয়ে।

এর পরের কিছু দিনের খবর রাখি না। শুনেছিলাম মরিয়া হয়ে তাপস মধ্যভারতের কোন এক অখ্যাত শহরে চলে গিয়েছে। কোন কাঠের গুদামে হিসাব লেখার কাজ নিয়ে।

সেই সময় গোটা দুই কবিতা এদিক ওদিক লিখেছিল। নিস্তেজ কবিতা। ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে পিছিয়ে যাচ্ছে, কবিতার প্রতি ছত্রে এমন পশ্চাদপসরণের আভাস।

তারপরের খবরও কানে এসেছে। তাপস হাসপাতালে। অসুখের বিবরণ জানতাম না, অবশ্য জানার চেষ্টাও করি নি। তখন

আমার গোটা দুই উপন্যাস রুপালী পর্দায় প্রতিফলিত হবে, তারই তোড়জোড়ে ব্যস্ত ছিলাম। ছবিগুলো দাঁড়িয়ে গেলে, আমিও দাঁড়াব। ডিরেক্টরকে খুশী করার জন্য সংলাপ থেকে সঙ্গীত সবই রচনা করছি, তারই ফাঁকে হঠাৎ নজরে পড়ল।

বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই কেউ বোধ হয় পত্রিকাটা দেখাল। তাপসের কবিতা। সারা কবিতা জুড়ে তার জ্বালা। মানুষের পৃথিবীকে অভিসম্পাত, সমাজব্যবস্থার উপর দারুণ কশাঘাত। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড, এসব সত্ত্বেও নিটোল কবিতা হয়েছে।

পর পর মাস ছয়েক চলল। গোটা ছ-সাত কবিতা প্রগতিশীল পত্রিকায়। প্রত্যেকটি কবিতা মুক্তাবিন্দুর মতন সম্পূর্ণ, তেমনি পবিত্র। বোঝা গেল তাপস সেন জীবনের নতুন একটা দিকের সন্ধান পেয়েছে। শুধু লেখনীর স্পর্শে এমন কবিতা সম্ভব নয়, হৃদয়ের স্পর্শেরও প্রয়োজন।

সেই সময় কবিযশঃপ্রার্থী কয়েকজন তাপসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু দেখা পেয়েছিল কি না জানি না, কারণ কিছু পরে তার মৃত্যু-সংবাদ দেখেছিলাম। কোন দৈনিকে নয়, বোধ হয় কোন ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকায়।

তারপর তাপস সেনের কাব্য-সংকলন বের করার একটা প্রচেষ্টা চলেছিল। এজন্য চাঁদা সংগ্রহও শুরু হয়েছিল, বোধ হয় নিজেও কিছু দিয়েছিলাম, কিন্তু কোন কাব্য-সংকলন প্রকাশিত হয় নি। বইয়ের বাজারে ঘোরাঘুরি করতে হয়, সংকলন বের হলে নিশ্চয় চোখে পড়ত।

তাপস সেনের নাগাল পেলেন কী করে? মহিলাকে সোজা-সুজি প্রশ্ন করলাম।

মহিলা হাসলেন। ম্লান, বিবর্ণ হাসি। আস্তে আস্তে বললেন, উনি যখন আকোলার হাসপাতালে, তখন বাবার কাজের জন্য

আমরাও সেখানে। সেই সময় লেখাপড়া ছাড়া আমার একমাত্র নেশা সই যোগাড় করা। নামকরা কোন লোককে হাতের কাছে পেলেই অটোগ্রাফ-খাতা এগিয়ে দিই। সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ, কাউকে বাদ দিই না। এক ডাক্তারের মারফত খবর পেলাম তাপস সেন ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে। তখন বয়স কম, কিন্তু সাহস অনেক বেশী। এখন যে-কাজ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হই, মনে মনে হাজারবার চিন্তা করি, তখন তাতে সঙ্কোচের বালাই ছিল না। অটোগ্রাফ-খাতা হাতে নিয়ে হাসপাতালের আনাচে-কানাচে ঘুরি। ডাক্তারদের অনুরোধ জানাই, নার্সদের খোশামোদ, কিন্তু তাঁরা সবাই বারণ করেন। সই দেবার মতন অবস্থা নয় তাপস সেনের। এখন তাঁকে একটুও ডিসটার্ব করা উচিত নয়।

আমি হাল ছাড়ি নি। রোজই তাপস সেনের খবর নিই। একটু ভাল হয়ে উঠলেই অটোগ্রাফ-খাতা নিয়ে গিয়ে দাঁড়াব। এই ভরসায়।

কিন্তু কিছুতেই আর সুবিধা হয় না। ক্রমে তাপস সেনের অবস্থা মন্দের দিকে, অথচ এত কাছে এসে এত বড় কবি আমার খাতায় নিজের স্বাক্ষর রেখে যাবেন না, তা কি হতে পারে।

তখন সে-বয়সে সব কবিতা ভাল লাগার মন নিয়ে তাপস সেনের কবিতা পড়েছিলাম। নতুনতর লেগেছিল। চাঁদ, তারা আর হাল্কা মেঘের যুগে, এমন করে বজ্র-বিদ্যুতের কথা আর কেউ বলেন নি। এমন করে লেখেন নি ভেঙেপড়া মানুষের কাহিনী, ব্যথা, বেদনা আর দীর্ঘশ্বাসের কথা।

একদিন সুযোগ জুটে গেল।

অন্য কোন ঘরে বোধ হয় কোন রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে থাকবে। মফঃস্বলের ছোট হাসপাতাল। ডাক্তার আর নার্সের সংখ্যাও পরিমিত। সকলেই সেদিকে ছুটেছে। সেই ফাঁকে পা টিপে টিপে আমি তাপস সেনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে ছিলেন, বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, দেখুন, অটোগ্রাফ দেবেন একটা ?

তাপস সেন অতি কষ্টে পাশ ফিরলেন। চেহারা দেখে আমি চমকে উঠলাম। মানুষ নয়, মানুষের কঙ্কাল। চোয়াল-ওঠা বিবর্ণ মুখ নিষ্প্রভ কোটরগত দুটি চোখ ; কপালে, গালে নীল শিরার জট।

অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলেন। একবার আমার দিকে আর-এক বার আমার প্রসারিত হাতে ধরে-থাকা অটোগ্রাফ-খাতাটার দিকে।

বিড় বিড় করে বললেন, সই, আমার সই।

বললাম, হ্যাঁ, আপনার সই, সেই সঙ্গে আপনার দু লাইন কবিতা।

তবু যেন তাপস সেনের চেতনা নেই। এক দৃষ্টে মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন। দৃষ্টিতে কৌতূহল আর বিস্ময়ের মিশেল।

আমি ঘাড় ফিরিয়ে একবার পিছন দিকে দেখে নিলাম। বলা যায় না, এখনি হয়তো নার্স কিংবা ডাক্তার এসে পড়বে, তারপর একটুও না দেরি করে আমাকে বের করে দেবে খাতাসুদ্ধ। সব মেহনত খতম। তাই বললাম, একটু তাড়াতাড়ি নিন, আমার সময় খুব কম। তাপস সেন হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে কলমটা টেনে নিলেন, খুব আস্তে বললেন, সময় কি আর আমারই ছাই বেশী আছে। কলমটা আকড়ে ধরে শুয়ে শুয়েই অটোগ্রাফ-খাতাখানার উপর ঝুঁকে পড়লেন।

তারপরই কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। তাপস সেনের শীর্ণ কাঠামোটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। হাতের কলম ছিটকে পড়ল মাটিতে। দু হাতে বিছানার চাদরটা মুঠো করে ধরলেন।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম। এত রক্ত কোথায় ছিল ওই পাণ্ডুর দেহে। বিছানার চাদর, বালিশ, মাথার কাছে টিপয়ের উপর

রাখা টেম্পারেচার চার্ট, রক্তে লাল হয়ে গেল। আমার অটোগ্রাফ-খাতাটাও বাদ গেল না। রক্তের ছিটে এসে লাগল খোলা পাতার ওপর।

ভয়ে খাতাখানা নিয়ে বাইরে পালিয়ে এলাম। তারপর যতবার পাতাটা ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েছি, কিছুতেই পারি নি। ভেবেছি তাহলে কবি তাপস সেনের কোন চিহ্নই যে থাকে না আমার অটোগ্রাফ-খাতায়।

মহিলা থামলেন। তাঁর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার খাতার দিকে দেখলাম।

বিবর্ণ রক্তিম ছোপ। সারা পাতা জুড়ে। কবি তাপস সেনের স্বাক্ষর।

তারপরই কথাটা মনে পড়ল। এর চেয়ে ভাল স্বাক্ষর তাপস আর কীভাবেই বা দিতে পারত! হাতের কয়েকটা আঁচড়ে এত কথা লিখতে পারত না। এভাবে ফোটাতেও পারত না তার কবিতার মর্মবেদনা।

॥ পঁচিশে বৈশাখ ॥

মতলবটা প্রথম মাথায় এল তিনকড়ি নন্দীর। ম্যাকফার্সন কোম্পানীর ফাইল ক্লার্ক। বসে একেবারে কোণের দিকে। সারাটা দিন যে কি করে বসে বসে ঈশ্বরই জানেন। এক ফাইল আনতে বললে আর-এক ফাইল নিয়ে আসে। চিঠির খোঁজ করলে দিন সাতেকের মধ্যে সে চিঠির সন্ধান পাওয়া যায় না। সারা দিনে কত যে বকুনি হজম করতে হয় তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তবু মানুষটার মুখে সব সময় হাসির আভাস। দুঃখ-কষ্ট সব পলকে ঝেড়ে ফেলে। অফিসের সকলের দায় বিপদে বুক দিয়ে পড়ে।

ফাইলের ওপর আঁচড় কাটতে কাটতে তিনকড়ি সামনের চেয়ারের রামতনু বাবুকে বলল, দাদা শুনছেন ?

রামতনুবাবু লেজারে টোটাল দিচ্ছিলেন, আচমকা ডাকে খিঁচিয়ে উঠলেন, আঃ, কি যে পিছু ডাকো কাজের সময়।

তিনকড়ি হাসল, পেছনে বসিয়েছেন, পিছু না ডেকে আর কি করি বলুন।

রামতনু বাবু হাতের যোগফলটা পেন্সিলে লিখে চেয়ার ঘোরালেন, কি তোমার কথা বল ? নতুন সিনেমা কিছু এসেছে পাড়ায় ? না খবরের কাগজে মজাদার কিছু কাহিনী পড়লে ?

না, না, সে সব কিছু নয়। বলছিলাম কি অফিসে এবার পঁচিশে বৈশাখ করলে হয় না দাদা ?

টেবিল থেকে চশমাটা কুড়িয়ে নিয়ে রামতনুবাবু চোখে দিলেন, তারপর বললেন, পঁচিশে বৈশাখ আবার করবে কি হে, চব্বিশের পর আপনা আপনিই তো পঁচিশে আসছে।

আরে তা বলছি না, তিনকড়ি চেয়ারটা সামনের দিকে টেনে নিল, অফিসে রবীন্দ্র জয়ন্তী করলে কেমন হয়?

নীরদ ফাইলের খোঁজে এসেছিল; কথাটা কানে যেতেই দাঁড়িয়ে পড়ল, কথাটা মন্দ বলে নি তিনকড়ি। অন্য অফিসে ফাংশান তো লেগেই আছে। আজ থিয়েটার, কাল জলসা, রোজই কিছু না কিছু। এ পোড়া অফিসে আজ ছ-সাত বছরের মধ্যে কিছু হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না।

নীরদের অবশ্য আফসোসের কারণ আছে। গানবাজনার শখ ষোল আনা, গানের গলাও আছে একটু, কিন্তু বেচারী সুযোগ পাচ্ছে না। পড়ায় জলসার আয়োজন হলেই গিয়ে দাঁড়ায় তবে ছোকরারা পাত্তা দেয় না। বাইরে থেকে সব জাঁদরেল গাইয়ে নিয়ে আসে, তারাই রাত ভোর করে দেয়, নীরদেব আর ডাক পড়ে না। অফিসে এমন একটা সুযোগ এলেই নীবদের পোয়া বারো। এত কষ্টে-শেখা গানগুলোর তবু গতি হয়।

আজ বাংলা মাসেব কত হল হে? রামতনুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

তেইশে।

তবে তো মাঝে আর-একটা মাত্র দিন।

আজই টিফিনের সময় একটা মিটিং ডাকা যাক। কাব কি মত শোনা যাবে। তিনকড়ি নীরদের দিকে ফিরে বলল।

মিটিং না হয় করলে কিন্তু কথাটা কর্তাদেব কানে তুলতে হবে তো? রামতনুবাবু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন।

কর্তা মানে ডিরেক্টর হরসুখ জৈন আর ম্যানেজার গুপ্ত সায়েব। সোজাসুজি তাঁদের নাগাল পাওয়া মুস্কিল। যেতে হবে একাউন্টেন্ট সুব্রামণিয়মের মারফত। সাত্ত্বিক লোক, কেতাদুরস্ত। কপালে ফোঁটা, গলায় টাই দুই-ই আছে। সকলকেই খুশী রাখাব চেষ্টা

করে। কারো সাতে পাঁচে নেই। যেখানে পয়সা খরচের বালাই নেই, সেখানে সমবেদনা জানাতে এগিয়ে আসে।

আগের দিন হলে এত অসুবিধা ছিল না। ম্যাকফার্সন আর অ্যাশলি জাঁদরেল দুই সাহেব কামরা আলো করে বসতেন। দুজনের কেউই জল ছুঁতেন না কোন দিন। দিল দরিয়া মেজাজ। ঘোড়দৌড়ে বাজী-ধরা ঘোড়া প্রথম হলে অফিসই বন্ধ হয়ে যেত তিনটের সময়। অ্যাশলি সায়েব নিজের হাতে নোটের গোছা এগিয়ে দিতেন বড়বাবুর দিকে। বাবুরা খানাপিনা করুক। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নয়।

আজকাল কাজের ঝামেলাও বেড়ে গেছে হাজার গুণ। আগে ছিল চামড়া আর ওষুধের কারবার, ইদানীং তার ওপর জুটেছে রং, পাট আর কাপড়ের কলের হাঙ্গামা। কাজ বেড়েছে কিন্তু লোক বাড়ে নি। যে ঘোড়া ট্রাম টানতো তাকে দিয়েই টম টম টানার চেষ্টা। দু-এক জন আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু সুবিধা হয় নি। তবে লোক কেউ খারাপ নয়। মানিয়ে গুনিয়ে চলতে পারলে ওরই মধ্যে দুঃখ-দরদ বোঝেন, কান্নাকাটি করলে ছুটিছাটার সঙ্গে এদিক ওদিক বাড়তি টাকাও কিছু পকেটে আসে।

মিটিংয়ে প্রায় সবাই রাজী। আর কিছু হোক না হোক, দুটো নাগাদ ছুটিটা তো পাওয়া যাবে, বরাত ভাল হলে আরো আগে অফিস বন্ধ হওয়াও বিচিত্র নয়। তাছাড়া যারা কর্মকর্তা হবে তাদের তো সাতখুন মাপ। কাজের ছুতোয় পুরোটা দিনই বাইরে ঘুরে বেড়ানো চলবে।

এ সব তো হল, কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার লোক কই! যাকে বলে সে-ই পিছলে পড়ে। কোন ওজর দেখিয়ে পাশ কাটায়। শেষকালে সবাই মিলে ধরে বসল ত্রিলোচনবাবুকে। বড়বাবু। বহু পুরোনো লোক। একদা ম্যাকফার্সন সায়েবের ডান হাত ছিলেন। ওঁর কথায় কোম্পানীর মত পালটাত।

আজকাল ততটা প্রতাপ না থাকলেও সবাই মান্য করে। দরকার হলে হরসুখবাবুর কামরায় ডাক পড়ে মাঝে মাঝে। বছর খানেক পরেই রিটায়ার করবেন।

আমাকে আবার এ সবের মধ্যে কেন। ত্রিলোচনবাবু আপত্তি তুললেন। কিন্তু আপত্তির সুর ক্ষীণ। এ অফিসে ওঁকে ডিঙিয়ে কেউ কিছু করবে তাও সহ্য করতে পারবেন না।

বা রে আপনি ছাড়া এ কাজের ভার আর কে নেবে। ছেলে-ছোকরারা হৈ হৈ করে উঠল।

বেশ গুপ্ত সায়েবকে বলব'খন।

শুধু বলা নয় বড়বাবু, ওই সঙ্গে চাঁদাও কিছু আদায় করে দিতে হবে। খরচ আছে তো। নমোঃ নমোঃ করে সারলেও মন্দ পড়বে না। ফোটো কেনা আছে, ফুল আর মালার দাম, তার ওপর খাওয়া-দাওয়ার সামান্য একটু আয়োজনও করতে হবে। শুকনো মুখে কি আর উৎসব চলে!

ত্রিলোচনবাবু পরের দিন থেকেই কোমর বেঁধে লাগলেন। প্রথমে গুপ্ত সায়েব না, না, করেছিলেন। অফিসের মধ্যে কেন আবার এই বাড়তি হাঙ্গামা। সারা দেশ জুড়ে উৎসব তো হবেই, যার ইচ্ছা তারই একটাতে যোগ দিলেই পারে।

ত্রিলোচনবাবু বোঝাবার ভঙ্গীতে বললেন, দেশ জুড়ে উৎসব তো আছেই, তাবলে এই সূত্রে আমাদের অফিসের কজনও যদি মিলতে চায়, না বলা কি উচিত হবে। অন্যায় কাজ তো আর কিছু করছে না। এ সব বিষয়ে উৎসাহ তো ভাল।

গুপ্ত সায়েব বহুকষ্টে নিমরাজী হলেন। ত্রিলোচনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে হরসুখবাবুর কামরায় ঢুকলেন।

কাপড়ের মিল ঘুরে হরসুখ জৈন সবে এসে চেয়ারে বসেছেন, দরজার আওয়াজে মুখ তুললেন।

কি ব্যাপার মিষ্টার গুপ্ত?

মিষ্টার গুপ্ত যথাসম্ভব সংক্ষেপে ব্যাপারটা বললেন। আশ্চর্য কাণ্ড, কথা শেষ হবার আগেই হরসুখ প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

বড়ি আচ্ছি বাত। খুব ভাল কথা। রোবীন্দরনাথ ভারি আদমি ছিলেন। কবিতায় বাতচিত করতেন। আমাদের দেশের সোম্মান বাড়িয়েছেন, তাঁর পূজা আলবৎ আমরা কোরবো। এই নিন, শো রুপেয়া, আরো যদি দরকার হয়, চাইয়ে নিবেন।

নোট নিয়ে ত্রিলোচনবাবু বিজয় গর্বে ফিরে এলেন। সবাই ছেঁকে ধরল তাঁকে। সব শুনে তাজ্জব। লোকটার পেটে পেটে এত। ছত্রিশ প্যাঁচ পাগড়ির তলায় এত বুদ্ধি বিবেচনা!

দু-এক জন ঠিক করেছিল বাইরে থেকে কোন সাহিত্যিক কিংবা অধ্যাপককে নিয়ে আসবে সভাপতিত্ব করার জন্য; কিন্তু একশ টাকাব নোট মুঠোয় আসার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রস্তাব নাকচ। বাইরের লোক খামকা চেঁচাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, খাবারেও ভাগ বসাবে, অফিসের লোকেরা হয়তো কিছু বলবার সুযোগও পাবে না। তার চেয়ে হবসুখ জৈনই সভাপতির চেয়ারে বসবেন। একূল ওকূল দুকূল থাকবে। সভাকে সভা, চাকবিকে চাকরি, দুই-ই বজায় থাকবে।

তাই ঠিক হল। হরসুখ জৈন সভাপতি, প্রধান অতিথি মিঃ গুপ্ত। উদ্বোধন সঙ্গীত নীরদবাবু। ববীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে আবম্ভ করার ইচ্ছাই সকলেব ছিল কিন্তু নীবদবাবু বেঁকে দাঁড়াল। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজাব কোন মানে হয়? তার চেয়ে অন্য গান গাইবে। লাগসৈ গানও হাতে আছে। তাব ভাগ্নের লেখা, সুর দিয়েছে সে নিজে। বরং পরেব গানগুলো রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইলেই হবে।

অফিসের প্রায় সকলকেই বলতে দিতে হবে। খোদ ডিরেক্টরকে শোনাবার এমন সুযোগ রোজ তো আর পাওয়া যায় না। ত্রিলোচনবাবু কিছু বলবেন, রামতনুবাবুও। জুট ডিপার্টমেন্টের অলকবাবুকেও বাদ দেওয়া যায় না। ভদ্রলোক অভিনয় ভালই

করে। ভাল যে করে হাবে ভাবেই তা প্রকাশ। সোজা ভাষায় কথা বিশেষ বলেই না। অফিসের দু-এক জন দেখেছেও তার অভিনয়। ভাল অভিনয়, তারিফ করার মত। তাকেও রাখতে হবে। বুড়ো ক্যাসিয়ার শিবরামবাবু রয়েছেন। ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছিল তিনিও কিছু বলতে চান, কিন্তু তাঁর নাম উঠতেই আপত্তি জানালেন। না, এ বয়সে এ সব আর নয়, এক সময় বিপিন পালের সঙ্গে পার্কে বহু বক্তৃতা দিয়েছেন। সে অভ্যাস ঢের আছে। এখন আর ওসব ভালোও লাগে না। আর বলবেনই বা কাদের। সে সব লোকও আর নেই; তার চেয়ে তাঁর মেয়ে আর ছেলেকে নিয়ে আসবেন। মেয়ে গান গাইবে। বাগনানের নিস্তাবিণী বিদ্যালয়ে পব পর দু বছর প্রাইজ পেয়েছে শ্যামাসঙ্গীতে। দু-তিন মাসের মধ্যে বেডিয়োতেও গান দেবে। সপ্তাহে একটা করে চিঠি আসছে বেডিয়ো কর্তৃপক্ষ থেকে, কিন্তু শিবরামবাবুর খুব ইচ্ছা নেই। মধ্যবিত্ত ঘবের মেয়ে। ভাল ছেলে হাতে পেলেই পাত্রস্থ করবেন, ওসব গানবাজনার দিকে বেশী ঝোঁক না যাওয়াই ভাল। কিন্তু মেয়ের মার এক গোঁ। বিয়ে যখন হবে তখন হবে, তা বলে গানের এমন গলা মেয়ের, বাইবেব পাঁচজন শুনবে না। রেডিয়োতে গাইলেই দেশময় ছড়িয়ে পড়বে।

নীরদবাবুর সামান্য মন খুঁতখুঁতানি। ভেবেছিল সব গান কটা নিজেই গাইবে, কিন্তু তাতে ভাগ বসাবার লোক আসছে বাইরে থেকে। কিছু করবার নেই। শিববামবাবু প্রাচীন লোক, তার ওপর চাঁদাও খুব খারাপ দেন নি।

শিবরামবাবুর ছেলে গান গাইবে না, আবৃত্তি করবে। শিবরাম-বাবু নিজে শিখিয়েছেন। অদ্ভুত শক্তি ওইটুকু ছেলের। বলাব কায়দায় মানুষকে হাসিয়ে হাসিয়ে মারে।

প্রোগ্রাম যখন প্রায় ঠিক, ট্যানারী ডিপার্টমেন্টের বিজয় লাহা দাঁড়িয়ে উঠল। মুখচোরা মানুষ, তাছাড়া অফিসের সঙ্গে বিশেষ

সম্পর্ক নেই। ট্যাংরার কারখানায় কাজ, সপ্তাহান্তে একবার করে অফিসে আসে মাইনের বিল নিয়ে।

আসল জিনিষই তো বাদ দিলেন।

সেক্রেটারী তিনকড়ি নন্দী ভ্রূ কোঁচকাল, কি ব্যাপার? আসল জিনিষ বাদ মানে? নগদ বারো টাকা দিয়ে বাঁধানো ছবির তো অর্ডার দেওয়া হয়েছে? তবে—

ছবিটবি নয়, যাঁর সম্মানে উৎসব করছেন, তাঁর মর্যাদা রাখার কি ব্যবস্থা হচ্ছে?

দু-এক জন বিরক্ত হল। ছোকরা হেঁয়ালী ছেড়ে সোজা কথায় বক্তব্য বললেই তো পারো।

মানে, কবির জন্মোৎসব, কবিতাপাঠ হবে না? বিজয় প্রায় মরিয়া হয়ে বলেই ফেলল।

কবিতাপাঠ! হলে মন্দ হয় না। কিন্তু স্বরচিত কবিতা না হলে আর পাঠ করে লাভ।

স্বরচিতই হবে, মুস্কিলটা আর কোথায়।

স্বরচিত! ত্রিলোচনবাবু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন. অফিসে কবি কেউ আছে না কি, জানতাম না তো।

খোঁজ আর কবে হল?

বটে, কে কবিতা লেখে?

সঙ্গে সঙ্গে বিজয় লাহার মুখে চোখে লালচে আভা। দু চোখে নববধূর লজ্জা।

ব্যাপারটা মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনকড়ি বলল, বেশ আপনিই কবিতা পড়বেন একটা। উদ্বোধন সঙ্গীতের পরেই তাহলে কবিতা পাঠ।

তিনকড়ি ঝুঁকে পড়ে প্রোগ্রামের খসড়া বদল করে নিল, তারপর বলল, ঠিক আছে। শুধু এইটুকু দেখবেন যেন খুব বড় না হয়ে যায়। তারপরে অনেক কিছু আছে কিনা, অন্ততঃ রাত আটটার

মধ্যে শেষ করতে পারলেই ভাল। আটটা চল্লিশের গাড়ীটা ধরতে না পারলেই সেই একেবারে এগারোটা তেইশ।

বিজয় লাহা স্মিতহাস্য করল, আপনাদের কি ধারণা, ইচ্ছা করলেই কবিতা ছোট বড় করা যায়? ভাব যখন আসে তখন কি আর লাইন গুনে তাকে বশ করা যায়?

কথা শেষ করেই বিজয় কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। বোধ হয় কবিতার উৎসের খোঁজে।

নীলমণি সরকার এতক্ষণ পিছনের দিকে বসেছিল। একটি কথাও বলে নি এ পর্যন্ত, মুখও খোলে নি। দশাসই চেহারা। পাকানো গোঁফ, মজবুত চেহারায় শক্তির আভাস। অবিবাহিত ভদ্রলোক। তিনকূলে কেউ নেই। মেছোবাজারে এক মেসে থাকে, রোজ সন্ধ্যায় ব্যায়াম করতে যায় শেয়ালদায়। সে উঠে দাঁড়াতেই সবাই শঙ্কিত হল। সর্বনাশ, পেশী-প্রদর্শনীর আবদার ধরলেই মুস্কিল। এমন একটা উৎসবে ব্যায়ামকৌশল দেখানো একটু বেমানান হবে।

শেষদিকের কি ব্যবস্থা করছেন? চেহারার উপযুক্ত গলা। দরজা জানলাগুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠল থরথরিয়ে।

কি ব্যবস্থা বল নীলমণি? খুব মোলায়েম গলা ত্রিলোচনবাবুর। একেবারে পাশাপাশি বসে কাজ করে। ছোকরা শুধু যে শক্তিই রাখে এমন নয়, কাজও করে। সারাক্ষণ একটি বাজে কথা বলে না, ঘাড় গুঁজে নিজের কাজে ব্যস্ত। কাজকর্ম একটু দেরিতে মাথায় ঢোকে এই যা, তবে সময়ের অপব্যয় করে না।

নীলমণি একবার সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বলল, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা একটা করবার কথা ছিল, তার জন্য চাঁদাও নেওয়া হয়েছিল আমাদের কাছ থেকে।

পরে জলযোগের ব্যবস্থা আছে বৈ কি। সভার শেষে সকলকেই খাওয়ানো হবে।

সবাইয়ের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। এই ব্যাপার। মারাত্মক কিছু নয়।

জলযোগ তো বুঝলাম, কিন্তু আইটেম কি কি? নীলমণি নাছোড়বান্দা।

তিনকড়ি ফর্দ পড়ে বলে গেল, চা এক কাপ, দুটো সিঙাড়া, একটা সন্দেশ, একটা রসগোল্লা।

ব্যস! হতাশায় নীলমণির গলার স্বর ভেঙে পড়ল।

আর কি হবে বলুন, তিনকড়ি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল, একেবারে পাতা পেতে বসিয়ে খাওয়ানো তো সম্ভব নয়।

পাতা পেতে না হয় নাই হল, তবে হাতে হাতে চারখানা করে লুচি আর আলুর দম তো হতে পারে। সভা শেষ করে বাড়ী ফিরতে প্রায় রাত দশটা। এতক্ষণ খালি পেটে থাকলে শরীরের দফা রফা।

একটা গুঞ্জন উঠল। কেউ নীলমণির স্বপক্ষে, কেউ বিপক্ষে।

ত্রিলোচনবাবু আপস করার চেষ্টা করলেন, বেশ তো, তোমাদের টাকা যদি বেশী উঠে থাকে তো অন্ততঃ দুখানা করে লুচি আর একটু করে আলুর দম ওর সঙ্গে তো দিতে পার। টাকা কম পড়লে আমাকে বলো, আমি আর-এক বার জৈনসায়েবের সঙ্গে দেখা করব। উনি তো আরো দিতে রাজীই রয়েছেন।

ব্যাপারটা ওখানেই চুকল, কিন্তু গোলমাল বাধলো উৎসবের দিন ছবি টাঙানোর সময়।

বাঁধানো ছবিটা নিয়ে অফিসের দু-এক জন সাহস করে ডিরেক্টার সায়েবের কামরায় ঢুকে পড়ল। জৈন সায়েবকে দেখাতে। তিনি দেখে তারিফ করলেন, তারপর বললেন, একটা কাজ করুন, ওই ফোটোটার পাশাপাশি আমার বাবার ফোটোটাও টাঙিয়ে দিন। বলতে নেই ওঁরই শুভেচ্ছায় তো সব কারবার চালু রয়েছে। বিকানীর থেকে এক বস্ত্রে লোটা সম্বল করে এ

শহরে পা দিয়েছিলেন। হরসুখ জৈন পিছনে টাঙানো বাপের তৈলচিত্রের দিকে চেয়ে সনিশ্বাসে কথাটা শেষ করলেন।

অগত্যা, রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি প্রেমসুখ জৈনের ফোটোও টাঙানো হল। রবীন্দ্রনাথের জন্য আনা দু গাছা মালা দু ভাগ হয়ে দু ফোটোতে ঝুলল। রজনীগন্ধার মোটা তোড়াটা খুলে দুটো ছোট তোড়া।

সভা আরম্ভ করার কথা ছিল দুটোয় কিন্তু গোছগাছ করে টেবিলচেয়ার সাজাতে দেরি হয়ে গেল। কাজ শুরু হল সাড়ে তিনটেয়।

প্রথমে উদ্বোধন সঙ্গীত। শিবরামবাবুর মেয়ে মালতী রায় গাইল,—নেচে নেচে আয় মা শ্যামা, আমার মানস-কমল মাঝে। একটু বেমানান কিন্তু গলা নিন্দের নয়। সকলেই তারিফ করল। সকলের চেয়ে বেশী করলেন শিবরামবাবু। সারাক্ষণ মাথা নাড়লেন আর আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখলেন হরসুখ জৈনের দিকে।

তারপর বিজয় লাহার কবিতা পাঠ করার কথা, কিন্তু সভাপতি নিজে উঠলেন ভাষণ দিতে। অবশ্য সবচেয়ে শেষে তাঁর বলবার কথা। বলতেনও তাই, কিন্তু উপায় নেই, সাড়ে চারটেয় ক্যালকাটা ক্লাবে চায়ের নিমন্ত্রণ। বিদেশ থেকে বাণিজ্যের প্রতিনিধি এসেছেন, তাঁরই সম্মানার্থে। কাজেই হরসুখ জৈনের থাকবার উপায় নেই।

সভাপতি বাংলাতেই বললেন। অনেক দিন এ দেশে আছেন, বাংলাভাষাটাও আয়ত্ত করেছেন মাঝামাঝি রকমের, তবে ওই উচ্চারণের কাঁটাঝোপে প্রায়ই মুখ থুবড়ে পড়তে হয়।

রোবীন্দরনাথ জাঁদবেল লোক ছিলেন। বহুৎ বই লিখিয়েছেন। শহরের ঝামেলা থেকে দূরে শান্তিনিকেতনে বাগানবাড়ী তৈরী করে মজাসে দিন কাটিয়েছেন। এখানে থাকতেন জোঁড়াসাকোয়।

জোড়াসাঁকোর কথা আসতেই হরসুখের পুরানো কথা মনে পড়ে গেল।

রোবীন্দরনাথ যে কুঠিতে থাকতেন তার ছুঠো কুঠি পরেই থাকতেন প্রেমসুখ জৈন। নিজের গদী বলে তখন তাঁর কিছু ছিল না, থাকতেন পুরাণচাঁদ লাখোটিয়ার আস্তানায়। তূলোর বীজ আর পাটের নমুনা নিয়ে মোকামে ঘোরাফেরা করতেন। বেশীর ভাগ দিনই কেটেছে কিছু চানা আর কলের জল খেয়ে। একটি একটি করে ইঁটের ওপর ইঁট গেঁথে যেমন ইমারত তৈরী হয়, তেমনি করে তিল তিল করে ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তির সৌধ গড়ে তুলেছিলেন প্রেমসুখ জৈন। তূলোর বীজ নিয়ে কারবার আরম্ভ করে আজকের এই ন্যাশনাল কটন মিলের পত্তন করেছিলেন। অনেকটা রোবীন্দর-নাথের মতনই। তবে তিনি ঝুঁকেছিলেন কেতাব তৈরীর দিকে আর প্রেমসুখের নজর ছিল তূলো আর পাটের ওপর। বছর দশেকের মধ্যেই ওই জোড়াসাকোতে প্রেমসুখ একটা বাড়ী খরিদ করে ফেলেছিলেন। রোবীন্দরনাথ পেয়েছিলেন পৈত্রিক বাড়ী, পূর্বপুরুষদের গড়া জিনিষ, কিন্তু প্রেমসুখের কৃতিত্ব আরো বেশী।

কথার মাঝখানে হাতঘড়ির দিকে চেয়েই হরসুখ চমকে উঠলেন। সর্বনাশ! আর সময় নেই, এখনি তাঁকে বেরিয়ে পড়তেই হবে। তিনি পাশাপাশি টাঙানো ছুটো ফটোর দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, সময় খুব কম। আমার অন্য একটা পার্টিতে যেতে হবে সে কথা আপনাদের আগেই জানিয়েছি। এই সুযোগে দেশের ছুটি মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজ আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

সঘন করতালিতে শেষদিকের কথাটা চাপা পড়ে গেল। হরসুখ নিচু হয়ে মিষ্টার গুপ্তর কানে কানে কি বলে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর ফেলে-যাওয়া মালাটা তুলে নিয়ে তিনকড়ি নন্দী পিছন পিছন ছুটল।

সভাপতি বেরিয়ে যেতেই সভার একটু অগোছাল অবস্থা, সেই ফাঁকে বিজয় লাহা উঠে পড়ল। কথা ছিল ছোট একটা স্বরচিত

কবিতা পড়বে কিন্তু দেখা গেল বগলে কাগজের বাণ্ডিল। মিহি সুরে গোটা তিনেক কবিতা পড়ল, তার মধ্যে দুটো মাঝারি সাইজের এই রক্ষা। কবে ভদ্রলোক গিরিডি গিয়েছিল, উশ্রী প্রপাত সম্বন্ধে একটা সনেট, তারপর 'ডায়মণ্ড হারবারে বসন্ত', শেষকালে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রায় পৌনে চার পাতা। নিজে একবার উজান বেয়ে শান্তিনিকেতন গিয়েছিল। কিন্তু কবি অসুস্থ থাকায় দেখা হয় নি, এ আক্ষেপও ছিল।

বিজয় থামতেই শিবরামবাবু নিজের ছেলেকে এগিয়ে দিলেন। মেজাজ এমনিতেই খারাপ, আবৃত্তিটা হরসুখ জৈনই যদি না শুনলেন তবে রেলভাড়া দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে ছেলেকে এনে লাভ! যাক, তবু মন্দের ভাল, মিষ্টার গুপ্ত রয়েছেন।

ছেলে কিন্তু গোলমাল বাধাল। কবিতার এক লাইন বলেই থেমে গেল আচমকা। পাংশু মুখ। দু হাতে সার্টের কলার টিপে ধরে স্মৃতিমন্থনের আপ্রাণ চেষ্টা। সঙ্গে সঙ্গে শিবরামবাবু উঠে গেলেন। ছেলের কাছে গুঁড়ি মেরে বসে হারানো কথার খুঁট ধরিয়ে দিতে লাগলেন। খুঁড়িয়ে, হোঁচট খেয়ে আবৃত্তিপর্ব শেষ হল। তারপর বারোয়ারিভাবে বক্তৃতার পালা। প্রায় সকলেই কিছু না কিছু বলল। ডিরেক্টর সায়েব না থাকুক, ম্যানেজার তো রয়েছেন। বক্তৃতা ভাল লাগলে খোদ কর্তার কানে ওঠা তো মোটেই বিচিত্র নয়।

ত্রিলোচনবাবু অফিস-অন্ত প্রাণ। এ ছাড়া দুনিয়ায় কিছু চেনেনও না, চেনবার আগ্রহও নেই। রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে তিনি অফিসের কথাই বেশী বললেন। এ সভা করার সুযোগ যে কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন তাঁরা সকলের ধন্যবাদ-ভাজন। ডিরেক্টব সায়েব হৃদয়বান সজ্জন ব্যক্তি, তাঁর তুলনা হয় না, গুপ্ত সায়েবও কম নন। এ যেন মণিকাঞ্চন যোগ। ডিরেক্টর সায়েব যে জ্ঞানগর্ভ বাণী আজ দিলেন তাতে রবীন্দ্রনাথকে নতুন আলোয় দেখতে

পেলাম। শেষকালে নাতির বইতে পড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা, 'আশ্বিনের মাঝামাঝি, উঠিল বাজনা বাজি', আবৃত্তি করে ত্রিলোচনবাবু নিজের জায়গায় ফিরে এলেন।

রামতনুবাবু পিছনেই ছিলেন। মুখফোঁড় লোক। ত্রিলোচনবাবুর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, বড়বাবু, আরো বছর খানেক এক্সটেন্‌শন আপনার মারে কে।

ওরই মধ্যে একটু নতুনত্ব দেখাল জুট ডিপার্টমেণ্টের অলকবাবু। কচ ও দেবযানী থেকে পড়ে শোনাল। নিজে কচ আর একাউণ্টস্ ডিপার্টমেণ্টের ফড়িং দেবযানী। ওর নাম একটা অবশ্য আছে, কিন্তু সে নাম ধরে কেউ ডাকে না। এমন কি দরকার হলে গুপ্ত সায়েব পর্যন্ত বলেন, ফড়িংবাবু কো বোলাও। এ নামকরণের হেতু তার প্যাঁকাটি-লাঞ্ছিত দেহ।

শেষকালে উঠল নীরদবাবু। একটু কেবল মুস্কিল। তবলচি আসে নি। পাড়ার এক ছোকরার আসার কথা, নীরদবাবু ঘর আর বার করল, কিন্তু তার পাত্তা নেই। দায়িত্বজ্ঞান যদি কিছু থাকে আজকালকার ছেলেদের। মনে মনে গর্জাতে গর্জাতে নীরদবাবু হারমোনিয়মের সামনে বসল। সঙ্গত করল অফিসেরই হেম বসাক। এমন কিছু উঁচুদরের বাজিয়ে নয়, তবে চালিয়ে গেল কোন রকমে। গানের চেয়ে মুখের ভঙ্গিতেই নীরদবাবু সভা মাত করল।

নীরদবাবু গান শুরু করতেই নীলমণি বেরিয়ে গেল। কমিটি অনেক ভেবে চিন্তে তার ওপরই খাওয়া-দাওয়ার ভার দিয়েছে। শেষকালে বদনামের ভাগী হতে না হয়। নীলমণি সিঙ্গাড়া, মিষ্টি আগেই এনে রেখেছে, কেবল দোকানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এসেছে লুচিগুলো গরম গরম ভাজিয়ে নিয়ে যাবে, সেই সঙ্গে আলুর দম। ঘি খারাপ কি-না, দু-একখানা লুচি চোখে দেখলেই মালুম পড়বে। নীলমণিকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়।

বেয়ারাদের হাতে খাবারের চ্যাঙারি দিয়ে নীলমণি যখন ফিরল তখনও নীরদবাবুর গান হচ্ছে। তবে দম দেখে মনে হচ্ছে এই বোধ হয় শেষ গান।

অফিসে ঢোকবার মুখেই নীলমণি বাধা পেল। ঠিক দরজার কাছে যেখানে লালশালুর ওপর রূপোলী অক্ষরে অফিসের নাম আর উৎসবের বিবরণ লেখা আছে ঠিক তার সামনে আলখাল্লা-পরা দীর্ঘকায় এক ভদ্রলোক। অফিসের কেউ যে নয় সেটা নীলমণি এক নজরেই বুঝতে পারল। এই সব ব্যাপারে পথচলতি লোক দু-এক জন ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। গোলমালে কে আর দেখছে। তারপর চেটে পুটে খেয়ে দেয়ে সরে পড়ে। কিন্তু অত কাঁচা ছেলে নয় নীলমণি।

ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে জোরগলায় বলল, কি চাই মশাই এখানে? কথার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা করেই পাঞ্জাবীর সব কটা বোতাম খুলে দিল। পেশীবহুল বুক। নিরেট, ইস্পাত-সদৃশ।

ভদ্রলোকটি থতমত খেয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। ঘাড় অবধি কুঞ্চিত রূপোলী কেশ, আবক্ষ দাড়ি। একটু থেমে, কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, না, চাই না কিছু, মানে উৎসবটা দেখতে এসেছিলাম।

নীলমণি এক পা এগিয়ে পথরোধ করে দাঁড়াল। বিদ্রূপতরল গলায় বলল, ওঃ, উৎসব দেখতে এসেছেন? মাপ করবেন, এখানে সুবিধা হবে না, সরে পড়ুন।

ভদ্রলোকের আয়ত দুটি চোখ নিমেষের জন্য জ্বলে উঠল। উত্তর দিলেন, সুবিধা যে হবে না, আগেই বুঝেছি। তবে কেমন এক রোগ, আজকের দিনে কেউ কোথাও উৎসব করলে, না এসেও পারি না। আচ্ছা নমস্কার।

দীর্ঘদেহ ভদ্রলোকটি ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ির অন্ধকারে মিশে গেলেন।

॥ অভিযোগ ॥

প্রকাশক পরাশর মোদক কথা বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। দুটো হাত প্রসারিত করে দিয়ে বললেন, আরে আসুন, আসুন।

এ আবাহন যে কোন সাহিত্যিককে নয়, পিছন দিকে না চেয়েও সেটুকু বুঝতে পারলাম। যাঁর বইয়ের আড়াই মাস অন্তর সংস্করণ হয়, তাঁকে দেখেও মোদক এত বিচলিত হন না। চোখ কুঁচকে একটু হাসি, কিংবা ঘাড়টা একটু কাত। ব্যস, তার বেশী নয়।

পিছন ফিরে চাইতেই প্রথমে নজরে পড়ল ভ্রমরকৃষ্ণ গাড়ীটার ওপর। ততক্ষণে দরজার হাতল ঘুরিয়ে মালিক নেমে পড়েছেন। পামবিচ স্যুটে, দামী সিল্কের টাই আর মাথার ফেল্ট হ্যাট আভিজাত্যের নিশানা। একটু এগিয়ে আসতেই হাতের দশটা আঙুলে গোটা চারেক হীরা আর বৈদুর্যমণির ঝিলিক। টাই-পিনের মূল্যবান দ্যুতিটুকুও চোখ এড়াল না।

কবে ফিরলেন দিল্লী থেকে? মোদক দুটো হাত জড়ো করে নিজের বুকে রাখলেন। ঠোঁটের পর্দা সরিয়ে দাঁতের বাহার। দুটি চোখ খুশীতে ডগমগ।

চট করে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। ভদ্রলোক পাইপ ধরাতে ব্যস্ত। গোটা তিনেক কাঠির অপব্যয়। পাখার আওতা থেকে সরে গিয়ে কৃতকার্য হলেন। বার কয়েক সুখটান দিয়ে বললেন, কাল ফিরেছি। ফিরতে কি দেয়। আজ মিটিং, কাল ডিনার, পরশু লাঞ্চ। একেবারে অতিষ্ঠ করে মেরেছে।

তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গে মোদক মশাই ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। কপালে, গালে অসন্তোষের আঁচড়। ডিনার, লাঞ্চ, মিটিংয়ের চাপে তিনি নিজেই যেন বিব্রত, চোখ-মুখের এমনি ভাব।

ভদ্রলোক আরো দু-এক বার পাইপে টান দিয়ে বললেন, নতুন বই টই কিছু বেরোল নাকি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল বই বেরিয়েছে গোটা কতক।

কর্মচারীদের পার হয়ে মোদক মশাই নিজেই হাত বাড়ালেন শেল্‌ফের দিকে। অমনিতে নাগাল পেলেন না, টুলের ওপর উঠলেন।

আমি গিয়েছিলাম উপন্যাস বাবদ কিস্তির টাকা আদায় করতে। মেসের ম্যানেজার হুমকি দিয়েছে বার তিনেক, আজ হাতে করে কিছু না নিয়ে গেলে কুরুক্ষেত্র বাঁধবে। এখানে বই দেখানোর যা ঘটা, তাতে আমি বিশেষ সুযোগ পাব, এমন আশা বিরল। সময় থাকতে অন্য দু-একটি প্রকাশকের দবজায় যাতে গিয়ে দাঁড়াতে পারি, সেইজন্য গলা খাঁকরি দিয়ে বললাম, মোদক মশাই, আমি এখন চলি, বরং না হয় ঘুরেই আসব একবার।

দু হাতে বইয়ের স্তূপ নিয়ে মোদক মশাই ফিবে দাঁড়িয়েই চীৎকার করে উঠলেন, আরে কি আশ্চর্য! আপনাদের আলাপই করিয়ে দেওয়া হয় নি। ইনি হচ্ছেন মিস্টার বি. তালুকদার। স্বনামধন্য পুরুষ। কয়লার খাদ, অভ্রের খনি, শালবন, পাটের ব্যবসা, নানা কারবারের মালিক। আর ইনি সাহিত্যিক প্রভাত ঘোষাল। বেশ নাম করেছেন আজকাল। আমাদের এখানে এঁব গোটা চারেক বই আছে।

বাই জোভ, তালুকদার সায়েব ঘুরে দাঁড়ালেন, একটা হাত প্রসারিত করেছিলেন করমর্দনের প্রত্যাশায়, পাইপচাপা ঠোঁটে জড়ানো গলায় বললেন, 'মনের মশাল' আপনার লেখা তো ?

বিনীত কণ্ঠে স্বীকার করলাম, ওই বইটা আমারই।

'সোনার মিনার ?'

আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাও।

অপূর্ব লেখা মশাই আপনার। বই পড়ে কিন্তু মনেই হয় নি আপনার বয়স এত কম। অভিজাত সম্প্রদায়ের কাহিনী এমন দরদ দিয়ে আর কাউকে লিখতে দেখি নি। বিশেষ করে 'সোনার মিনার'-এর মিস্টার বসু, সুতপা, কল্যাণী—জীবন্ত চরিত্র। আমাদের আশে পাশে যেন দেখতে পাই এদের।

অনুভব করতে পারলাম সারা দেহের রক্ত মুখে এসে জমেছে। প্রশংসার ছিটেফোঁটা এদিক ওদিক থেকে পেয়েছি, কিন্তু এ যে প্রশংসার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার দাখিল।

একদিন আসুন না আমার ওখানে। আমি দিনরাতই নিজের ঝামেলায় ব্যস্ত থাকি, ওর মধ্যেই সময় করে বই টই পড়ি। কিন্তু আমার স্ত্রী আর মেয়েরা বইয়ের পোকা। অনবরত বই মুখে দিয়ে বসে আছে। ওদের জন্যই বইয়ের পিছনে আমার মাস মাস অনেক টাকা ঢালতে হয়। কি বলেন ?

তালুকদার সায়েব চোখ ফেরালেন মোদক মশাইর দিকে। সমর্থনের আশায়।

ততক্ষণে বইয়ের গোছা মোদক মশাই কাউন্টারের ওপর নামিয়ে রেখেছেন। তালুকদার সায়েবের দৃষ্টির উত্তরে আকর্ণ হাসলেন। তুটি চোখ মাংসপিণ্ডের তলায় উধাও।

এই নিন কার্ড, তালুকদার সায়েব আইভরি-ঝকঝকে কার্ড এগিয়ে দিলেন আমার দিকে, বিকেলের দিকেই সুবিধা। ফোন করে যদি আসেন তো খুবই ভাল হয়।

নিশ্চয় যাব কথা দিয়ে পথে নামলাম। রাস্তার মাঝ বরাবর গিয়ে কার্ডটা পকেট থেকে বের করলাম। মিস্টার বি. তালুকদার। 'সানিভিলা', অশোক রোড। কোণের দিকে ফোন নম্বরও রয়েছে। সুযোগ সুবিধা করে যেতেই হবে একদিন। বলা যায় না, চাকরি-

বাকরি সুবিধা হয়ে যেতে পারে একটা। মোহনলাল শঙ্করপ্রসাদের তেলের কলের হিসাব রাখার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই তাহলে। কয়লা, অভ্র, শালবন, পাট—এর যে-কোন একটার সঙ্গে আমাকে জুতে দিলে বরাত খুলে যাবে।

মাসখানেকের ওপর কেটে গেছে। যাই যাই করেও তালুকদার সায়েবের ওখানে যাওয়া হয় নি। আসল কথা সাহসে কুলোয় নি। সারা দুপুর ধরে নিজের হাতে জামা কাপড় সাবান দিয়েছি, জুতোজোড়া শুধু মেরামত করাই নি, ঘসে ঘসে বার্নিস-চকচকে করে তুলেছি। কিন্তু বেলা গড়িয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্যম উৎসাহ সব ঝিমিয়ে এসেছে। পীতাম্বর মুদী লেনের হিন্দুনিবাসের দু তলায় মেঝেতে মাদুর পেতে কলমের আঁচড়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের চরিত্র ফোটানো হয়তো যায়, লেখা যায় তাদের কল্পিত সুখ-দুঃখের কাহিনী, কিন্তু সাজানো ড্রয়িংরুমে রক্তমাংসের সেইসব চরিত্রদের সামনে বসে আলাপ-আলোচনার কথা মনে হলেই শরীর ঝিমঝিম করে। কোথায় বেফাঁস কিছু বলে ফেলব, যা শুনে আঁকা ভ্রূ বাঁকা হয়ে উঠবে, বিদ্রূপের রেখা ফুটবে রুজ-রক্তিম গালে, টিটকিরির লহর ছুটবে। তার চেয়ে দূরত্বের ব্যবধানই ভাল, অপরিচয়ের রহস্যই শ্রেয়।

কিন্তু নিরুপায়। একদিন প্রকাশকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মোদক মশাই তেড়ে এলেন, আচ্ছা লোক তো মশাই আপনি? তালুকদার সায়েব এত করে বলে গেলেন, আপনি একবার গেলেন না তাঁর বাড়িতে। ভদ্রলোক দুঃখ করছিলেন।

হ্যাঁ, যাব একবার, ঠিক সময় করে উঠতে পারছি না। আমতা আমতা করলাম।

কি এমন রাজকার্যে ব্যস্ত আছেন তা তো জানি না। আমাকে একটা বই দেবেন বললেন, তাও তো ছ মাস হয়ে গেল, একটি

পাতাও দেখালেন না এ পর্যন্ত। আরে মশাই আপনার ভালর জন্যই বলছি। তালুকদার সায়েবের কত বড় বড় জায়গায় আনাগোনা। আজকাল সব অফিসেই লাইব্রেরি রাখা একটা ফ্যাশান হয়েছে। যদি এক কলম লিখে দেন সে সব জায়গায় তো হু হু করে আপনার বই কেটে যাবে। তেলের দোকানে আর রগড়াতে হবে না নিজেকে।

এদিকটা আমিও যে একেবারে ভাবি নি তাও নয়। কেন যে যাই নি সে কথা আর যাই হোক, প্রকাশককে বলা যায় না। কিন্তু এবার মনে মনে সঙ্কল্প করে ফেললাম। তালুকদার সায়েবের বাড়ি আমি যাবই। সাহস সঞ্চয় করে ফেরবার পথে মোড়ের ডাক্তারখানায় গিয়ে ফোনও করে দিলাম নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে। একটি মহিলা কণ্ঠ। তালুকদার সায়েব নেই, ক্লাবে গেছেন, ফিরতে রাত ন'টা। পরের দিন বিকালে আমি দেখা করতে যাব। নিজের নাম বললাম, পরিচয়ও। ওপাশের কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, ও আপনি, বাবা বলছিলেন আপনার কথা। নিশ্চয় আসবেন। বাবাকে থাকতে বলে দেব। নমস্কাব। কণ্ঠ নিস্তব্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের দিকে নজর পড়ল। আধ-ময়লা ধুতি, পাঞ্জাবীর হাতা আর কাঁধ ফেঁসে গেছে বেশ কয়েক জায়গায়, চটির প্রায় মোহমুক্ত অবস্থা। স্ট্র্যাপের বন্ধন আর নেই। একটু মানুষের মত সেজে রাস্তায় বেরোতে আর দোষটা কোথায়। বলা যায়, হঠাৎ যদি তালুকদার সায়েবের মসীকৃষ্ণ বুইকটাই দাঁড়াত গা ঘেঁষে। আধুনিকা লাস্যময়ী কোন তরুণী তালুকদার সায়েবের নির্দেশে চোখ ফেরাত আমার দিকে। 'সোনার মিনার'-এর খ্যাত-নামা লেখকের এমনি ধূলিধূসর, দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থা। ঠোঁটের ফাঁকে ব্যঙ্গের হাসির ঝিলিক, দু চোখে করুণার ছিটে। ছি, ছি, লজ্জা ঢাকতে আমার ছুটে পালানো ছাড়া আব গতি থাকত না।

বাড়ি খুঁজতে মোটেই দেরি হল না। গেটে শ্বেতপাথরের ফলকে তালুকদার সায়েবের নাম খোদাই করা। সামনে লন। দিশী-বিদেশী ফুলের ঝাড়। লাল সড়ক। গাড়ি-বারান্দার কাছে তক্‌মা-আঁটা দরোয়ান, তার হাতে নিজের নাম আর আসার কারণ লিখে দিতে হল। মিনিট পাঁচেক, তারপরই দরোয়ান নেমে এসে সজোরে সেলাম ঠুকল।

ঠিক সিঁড়ির মুখেই দেখা হয়ে গেল তালুকদার সায়েবের সঙ্গে। ঝলঝলে সিল্কের পাজামা, ডোরাকাটা। মুখে পাইপ।

আসুন, আসুন। ফোনে আপনার আসার সংবাদ পেয়ে সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে দিয়েছি। মাইনিং এসোসিয়েশনের একটা ডিনার আছে, সেখানেও যাব না বলে দিলাম।

বিগলিত হলাম। এমন একটা সৌভাগ্য আমার জন্য অপেক্ষা করছে ভাবতেও পারি নি। সম্বল গোটা ছয়েক বই। কিছু কিছু বিক্রি হয়। কিন্তু সে বিক্রির রয়ালটিতে সংসার চলে না। তাই উপন্যাস লেখা হাতে তেলের কলের হিসাব লিখতে হয়। শুধু একলা হলে কোনরকমে হয়তো চলে যেত, কিন্তু দেশের বাড়িতে বিধবা মা রয়েছেন, অনূঢ়া বোন, ছোট একটি ভাই। মাঝে মাঝে হতাশা এসেছে। মনে ভেবেছি উপন্যাস লেখায় নষ্ট-করা সময়টুকু যদি প্রাইভেট টিউশন কিংবা অন্য কোন গদিতে খাতা-লেখার কাজে লাগাই, তাহলে হয়তো আরো কিছু পয়সা আসে হাতে। কিন্তু এই মুহূর্তে সব জ্বালা, সব দুঃখের অবসান হল। গোটা কয়েক বই আছে বলেই এমন একটা বাড়িতে ঢোকার আজ ছাড়পত্র পেয়েছি, আদর আপ্যায়ন সবই সেই জন্য। তেলের কলের কনিষ্ঠ কেরানীকে এ বাড়ির গেট পার হয়ে ভিতরে আর ঢুকতে হত না।

ঘাস-নরম গালিচা। চার ধারে ডিভান আর কোচ সাজানো। সমস্ত ড্রইংরুম জুড়ে রুচির পরিচয়। লাবণ্যময়ী একটি তরুণী

কৌচে বসে কি একটা বই ওল্টাচ্ছিল, তালুকদার সায়েব তার দিকে চেয়ে বললেন, মিলি, ইনিই প্রভাত ঘোষাল।

ও, তরুণী দাঁড়িয়ে উঠে ছুটি হাত কপালে রাখল, স্মিতহাস্যে বলল, আপনার লেখা আমাদের যে কি ভাল লাগে। দাঁড়ান, মাকে ডেকে আনি।

একটু পরেই তালুকদারগৃহিণী এলেন। বয়স্থা মহিলা, কিন্তু বয়স ঢাকবার আপ্রাণ প্রয়াস সারা দেহে। ফিনফিনে জর্জেট, নক্সা-আঁকা ব্লাউজ, কোমরে মাংসের ইশারা। রুজে, লিপস্টিকে, স্নো, পাউডারে মুখের আদিম অবস্থা কল্পনা করা সম্ভব নয়।

আপনি এসেছেন মিস্টার ঘোষাল। So kind of you. আমি ওঁর কাছে শুনে অবধি কেবল দিন গুণছি। কাল মিলি বলল, আপনি টেলিফোন করেছিলেন আজ আসবেন।

তালুকদারগৃহিণী আমার পাশের কৌচে বসলেন।

আপনার লেখার এরা অকৃত্রিম ভক্ত, তালুকদার সায়েব নিভে-যাওয়া পাইপে অগ্নি-সংযোগেব চেষ্টা করতে করতে বললেন।

সত্যি, খুব ভাল লাগে আপনার লেখা। 'নাগকেশর' বইটা আমি আর মিলি বোধ হয় পাঁচবার পড়েছি। নায়িকা চিত্রাকে আপনি যে ভ্যাগাবণ্ড খবরের কাগজের রিপোর্টার তপনের হাতে তুলে না দিয়ে, ব্যারিস্টার সৌমেন সেনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন সেজন্য thousand thanks. আজকাল অনেক বইতে এমন একটা বাহাদুরীর চেষ্টা প্রায়ই দেখা যায়। মিলের মালিকের মেয়ের সঙ্গে কারখানাব ফিটারেব বিয়ে দেওয়া। মানুষ সব সমান, হৃদয়ের মিলই সব, এই ধরনের বুকনি বইয়ের পাতায় পাতায়। আপনার বইয়ে এই সব cheap sentimentalism অন্তত স্থান পায় নি। ভারি আনন্দের কথা।

আপনার 'সোনার মিনার' আমার খুব ভাল লেগেছে। বিশেষ করে সুতপাকে। কি করে এমন সব চরিত্র আঁকেন? বাস্তব

জীবনে এরকম চরিত্রের খোঁজ পেয়েছেন নিশ্চয় ? মিলি তালুকদার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি আগেও কয়েকবার হতে হয়েছে। এর একটা লাগসই উত্তর সব লেখকেদেরই জানা। বাস্তব আর কল্পনার মিশেল, কিছু অনুভূতি, কিছু অভিজ্ঞতা এই নিয়ে চরিত্র গড়ে ওঠে। মাটি বাস্তবের, কল্পনার রংয়ের আঁচড়, এই দুইয়ে রূপ নেয়।

নতুন কিছু লিখছেন নাকি ? মিলি তালুকদার প্রশ্ন কবল।

একটা উপন্যাস আরম্ভ করেছিলাম, সেই কথাই বললাম। কবে শেষ করতে পারব, এমন এক প্রশ্নের উত্তব দেওয়া কঠিন।

একটু পরেই চা এলো, সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ আর কেক। মিলি তালুকদার নিজে বেয়ারাব হাত থেকে নিয়ে সামনের টিপয়ে রাখল। কৃতার্থ হলাম। মনে মনে বললাম, আমার বই ক'টা নিয়ে আসা উচিত ছিল। প্রথম পাতায় তালুকদাব সায়েবেব নাম লিখে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতেই দেখলাম, দরজাব গোড়ায় টেনিস র‍্যাকেট হাতে একটি ছোকরা উঁকি দিচ্ছে। বোধ হয়, তালুকদাব সায়েবের ছেলে। জীবন্ত লেখক দেখাব সুযোগ হয় নি কোন দিন, একদৃষ্টে দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

ঘণ্টাখানেকের ওপব কাটল নানা আলোচনায়। কথা দিতে হল এর পরে যেদিন আসব, উপন্যাসেব পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসব সঙ্গে করে। তালুকদারগৃহিণী আর তাঁর মেয়েকে পড়ে শোনাতে হবে। তাঁদের মতামত নিয়ে লেখার অদলবদল করব।

ওঠবার মুখে তালুকদার সায়েব বললেন, আপনি সময় পেলেই আসবেন মিষ্টার ঘোষাল। আপনার নতুন বই বেরোলেই যেন খবর পাই। আমাদের সমাজের চরিত্র আপনাব হাতে যেমন

ফোটে এমন আর কোন বইয়ে পড়ি নি। দু-এক জন লেখকের বই পড়ে মনে হয়, বড়লোক হওয়া যেন অপরাধ। কেবল আমাদের ছোট করার চেষ্টা, হেয় করার ইচ্ছা।

যখন সিঁড়ির শেষ চাতালে পা দিলাম, তখন বাইরে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমেছে। মনে মনে ঠিক করলাম, বাড়ি গিয়েই উপন্যাসটা নিয়ে বসতে হবে। তাড়াতাড়ি শেষ তো করতে হবেই, বইটা উৎসর্গ করতে হবে মিষ্টার আর মিসেস তালুক-দারকে। সঙ্গে মিলি তালুকদারের নামটাও জুড়ে দিতে পারলে ভালই হত, কিন্তু সঙ্কোচে বাঁধল। এতদিনের পরিশ্রম সফল হল, এমনি একটা আনন্দে ধবাকে প্রায় সবার সামিল ঠেকল।

লনে পা দেবার আগেই মুখোমুখি দেখা হল। রাস্তার গ্যাসের সদ্যজ্বালা আলোর কিছুটা এদিকে পড়েছে। আলোছায়ার আঁচড়। একটা হাত কপালে আড়াআড়িভাবে রেখে বৃদ্ধা এগিয়ে এলেন। খুব কাছে এলে দেখতে পেলাম, সারা মুখে বয়সের হিজিবিজি আঁচড়, গায়ের চামড়া কুঁচকে এসেছে. কিন্তু জ্বলছে দুটি চোখের তারা।

পাশ কাটিয়ে যাবার আগেই গলার আওয়াজ কানে এল, তোমারই বুঝি আজ আসবার কথা ছিল?

আজ্ঞে? কথাগুলো কানে গেলেও অর্থটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

মানে তুমিই বুঝি বই টই লেখো? 'সোনার মিনার', 'মনের মশাল', এ সব তো তোমারই লেখা?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম প্রভাত ঘোষাল। কিন্তু আপনি?

আমি? বৃদ্ধা হাসলেন। দু-একটি দাঁতের ভগ্নাংশ। আঁচলের খুঁটে আঙুল জড়াতে জড়াতে বললেন, আমার একটা পরিচয় আছে বটে, কিন্তু সে পরিচয় আমি কাউকে দিই না বাবা।

সব ব্যাপারটা কেমন ঘোলাটে। কথাবার্তায় ঠিক অশিক্ষিতা

শ্রেণীর বলেও মনে হচ্ছে না। জরাগ্রস্ত শরীর তবু মুখ-চোখের আদলে ফেলে-আসা সৌন্দর্যের ইশারা।

বৃদ্ধাই রহস্যের কিনারা করলেন, আমি বিজনের মা, মানে ওই তোমাদের মিস্টার তালুকদারের।

মিস্টার তালুকদারের মা! চোখ কুঁচকে আবার দেখলাম ভাল করে। সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে। পরনের কাপড় শতছিন্ন না হলেও, এমন কিছু অটুট নয়, খালি পা, হাতে জপের মালা। তালুকদারের সম্পদের পটভূমিকায় এমন একটা মা যেন বেমানান। ড্রইংরুমের ঐশ্বর্যের পরিপ্রেক্ষিতে এমন পোশাকেরও কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

কি বিশ্বাস হল না? বৃদ্ধার হাসি অম্লান।

না, না, বিশ্বাস না হবার কি আছে। অপ্রস্তুত অবস্থা।

অনেকেই বিশ্বাস করে না। মাঝে মাঝে আমারই সন্দেহ হয়।

আপনাকে তো ওপরে দেখলাম না? মানে ওদের বসবার ঘরে?

আমি কি ওসব ঘরে বসবার যোগ্য বাবা। সায়েব-সুবোর আমদানী ওখানে। কি বলতে কি বলে ফেলব, তাই ওপরে আর আমি উঠি না। আগে উঠতাম কিন্তু বৌমা, মানে মেমসায়েব রাগ করে। তাই পাকিস্থান থেকে এসে অবধি ওই সিঁড়ির নিচের ঘরটাতেই থাকি।

বৃদ্ধা অনর্গল বলে গেলেন। একটুও না থেমে। অবশ্য এমন একটা বয়সে বেশী কথা বলার সাধ হয়। কি জানি, হঠাৎ কখন সব কথা ফুরিয়ে যাবে, সেই ভয়ে মুখ বন্ধ করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এসব কথা আমার শুনে কি লাভ। তালুকদার সায়েব আভিজাত্য বাঁচাবার ভয়ে তাঁর মাকে কোথায় কোন ঘরে সরিয়ে রেখেছেন এসব আমার এলাকার বাইরে। আমার সঙ্গে তাঁরা যে

ব্যবহার করেছেন সেটুকু মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে থাকবে। মধ্যবিত্ত লেখকের কাছে তার দাম অনেক।

বিরক্ত হচ্ছ বাবা বুঝতে পারছি, বৃদ্ধা যেন মনের কথাটাই টেনে বের করলেন। আরো একটু এগিয়ে এসে বললেন, এসব কথা শোনবার জন্য তোমায় ডাকি নি বাবা। এসব আমাদের ঘরোয়া কথা। মাঝে মাঝে বুকের ভিতরটা কেমন টনটন করে ওঠে, তাই কথাগুলো আপনা থেকেই হুড় হুড় করে বেরিয়ে পড়ে। তুমি কিছু মনে কর না বাবা।

আজ্ঞে না, মনে করার আর কি আছে। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা করতেই বাধা পেলাম।

যাবার কি খুব তাড়াতাড়ি আছে বাবা?

চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালাম।

না, খুব তাড়াতাড়ি নেই। কিছু বলবেন?

একেবারেই তাড়াতাড়ি নেই, কিন্তু ভাল লাগছে না এই বৃদ্ধার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে। এখনও কানে বাজছে মিসেস তালুকদারের প্রশংসা-বাণী, মিলি তালুকদারের সুমিষ্ট গলার টুকরো টুকরো আলোচনা। চোখের সামনে ভাসছে তার আয়ত দুটি চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি, তালুকদার সায়েবের এগিয়ে অভ্যর্থনা করার ভঙ্গী। এই সময়ে বেরিয়ে চুপচাপ গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা করছে। সময় কাটাতে ইচ্ছা করছে কোন নির্জন জায়গায়। হাজার ভিড়ে, হাজার মানুষের চীৎকারে আজকের প্রশংসার টুকরোগুলো হারিয়ে না যায়।

তোমার বইগুলো আমিও পড়েছি বাবা।

আচমকা বৃদ্ধার গলায় চমক ভাঙল।

ও পড়েছেন? গলার স্বরে ঔদাসীন্যের রেশ মেশালাম। উপরি হিসাবে আরো দু-একটা প্রশংসার কথা শুনতে নেহাৎ মন্দ লাগবে না। কিন্তু সাজানো ড্রইংরুমে যে সব কথা এইমাত্র শুনে

এলাম তারই পুনরাবৃত্তি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে এমনই এক বৃদ্ধার মুখ থেকে শুনতে হবে, দুঃখ এইটুকুই।

হ্যাঁ বাবা পড়েছি কিন্তু তেমন ভাল লাগে নি। কথা বলতে বলতে বৃদ্ধা কাঠের টবে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন, কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে শুরু করলেন, কেবল রুজ পাউডারেব প্রলেপ-মাখা, কৌচ আর গদীতে-বসা মেয়েদেরই দেখলে বাবা? নকল হাসি, নকল জীবন, প্রেমের ভান এই নিয়েই জীবনদর্শন গড়ে তুলতে চাও। কিন্তু এত বড় একটা বিবাট দেশের এবা কতটুকু? যে আগুনে সারাটা দেশ পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছিল, সে আগুনের আঁচ থেকে এরা সন্তর্পণে বাঁচিয়েছে নিজেদের জর্জেট শাড়ি আব শিফন, সে আগুনের তাতে এক তিল প্রসাধন নষ্ট হতে দেয় নি।

কি বলছেন আপনি? চেষ্টা কবেও গলাব স্বব ঠিক বাখতে পাবলাম না। অনুভবে বুঝলাম, সবে যাচ্ছে পায়েব তলাব মাটি, তালুকদার সায়েবেব ড্রইংরুমে তিলে তিলে গড়ে-তোলা প্রশংসার সৌধ এক নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে।

ঠিকই বলছি বাবা। কথাগুলো শুনতে হয়তো খারাপ লাগছে, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পাববে একটু মিথ্যা বলছি না আমি। কলম যখন হাতে তুলে নিয়েছ তখন খাতা জুড়ে কেবল কি হিজিবিজি টানবে? একটু রক্ত মেশাবে না নিবের মুখে? তোমার বইতে নায়িকারা কেবল গাছের পাতাব ফাঁকে চাঁদ দেখে আর প্রেমের গান গায়। মোটব হাঁকিয়ে আধা-শহরে ডাক-বাংলোয় প্রিয়জনের অপেক্ষা কবে, স্বামীর সঙ্গে বিদেশে যায়, কৃষ্টির মিঠে বুলি আওড়ায়, তাই না?

বৃদ্ধা একটু দম নিলেন তারপর আস্তে আস্তে বললেন, কিন্তু এমন মেয়ের সন্ধান কি পাও নি বাবা, যাবা পঙ্গু স্বামী আব দুর্বল সন্তানকে বাঁচাতে উদয়াস্ত পুরুষের পাশাপাশি সংগ্রাম করে, নিজের হাতে শত্রু নিধনের জন্য ছেলেব হাতে পিস্তল তুলে দেয়,

লালসার শত প্রলোভন উপেক্ষা করে তিলে তিলে অনাহারে আত্মাহুতি দেয়। অনেক আছে বাবা, সারা দেশে এমন মেয়ে হাজার হাজার, লাখ লাখ ছড়িয়ে আছে। তাদের দেখবার চোখ নেই তোমার, তাই খুঁজে পাও নি। কিন্তু বাংলা ভাষায় লেখা, বাংলাদেশের উপন্যাসে এরাই যদি না রইল তবে কি দাম তোমার লেখার? প্রাণের স্পর্শ নেই এমন কাগজের বাণ্ডিলে সার সার কালির অক্ষর সাজিয়ে কি লাভ? কিছু মনে কর না বাবা, তোমার লেখার শক্তি আছে তাই তোমাকে এত কথা বললাম। আলোর বন্যায় মানুষ নিজকে হারায়, আসল সত্তা খুঁজতে হলে আলোর নিচে অন্ধকারেই হাতড়াতে হবে তাকে। চলি বাবা, আমার পূজার সময় হল।

দ্রুতপায়ে চলে এলাম। পালিয়ে এলাম তালুকদার সায়েবেব লন পার হয়ে। একটি কথাও মিথ্যা নয়, সব সত্য, কেবল রং চড়ালেই ছবি হয় না, প্রাণ চাই, দরদ চাই, বলিষ্ঠ তুলির টান চাই। চটুল কথার পর কথা সাজিয়ে যে মালা গাঁথা হয় তাতে দু-একটা মানুষ হয়তো খুশী হয়, কিন্তু সে মালা শিল্পের দেবতার গলায় পবানো যায় না। তার সঙ্গে চাই অভিজ্ঞতার রক্তচন্দন, বেদনাব ধূপ।

ফটক পার হয়ে মাঝ রাস্তায় এসে ফিরে চাইলাম। আলোর স্রোতে তালুকদার সায়েবের বাংলোর দোতলা উজ্জ্বল। পিয়ানোর মৃদু শব্দ ভেসে আসছে। কিন্তু আশ্চর্য, লনের আধ-অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তালুকদার সায়েবের মার রজতশুভ্র থান, দুটি চোখে অসহ্য দীপ্তি। দীপ্তি নয় দাহ।

॥ পঙ্কজা ॥

অভিনয় শেষ হতেই মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

পরচুলাটা সাবধানে মাথা থেকে খুলতে খুলতে বললাম, এখনও কথা! ছমাস ধরে রিহার্সেল দিয়েও কথা বলার শখ মেটে নি।

মেয়েটি একটু বোধ হয় বিব্রত বোধ করল, কিন্তু বিব্রত ভাবটা হাসিতে ঢেকে বলল, এতদিন তো নাট্যকাবের বসানো সংলাপই বলে এসেছি। নিজের কথা তো বলাই হয় নি।

মেক আপ ওঠাতে অন্তত: মিনিট পনের কুড়ি সময় নেবে। তাব মধ্যে বসে বসে শোনাই যাক মেয়েটির কথা। বললাম, বেশ বলুন।

মেয়েটিরও মুখে রঙের প্রলেপ, কিন্তু বোধ হয় এখন রং তোলবাব কোন চেষ্টা করবে না। তাই মাথায় আলতো ঘোমটা টেনে দিয়েছে যাতে পথচারীব নজবে না পড়ে।

ছু মাস ধরে মেয়েটিকে দেখছি। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তা মেয়েটি নয়। কাঞ্চনবরণী তো নয়ই, বরঞ্চ রংটা শ্যামাভই বেশী। মুখের আদল মাঝামাঝি। তবে চোখ ছুটি অপূর্ব। শুধু কটাক্ষেব মারফতেই যেন হাজার যুগের কাহিনী বলে যেতে পাবে। তবে এই মুহূর্তে রংয়ের কল্যাণে মেয়েটিকে অনিন্দ্যসুন্দরী দেখাচ্ছে। উজ্জ্বল বর্ণে, আয়ত লোচনে, রক্তিম অধরে, মনোহর গ্রীবাভঙ্গীতে রাজকন্যার সামিল।

মিনিট পাঁচেক। গালের রং প্রায় তুলে এনেছি। এবার নজব দিলাম গলার খাঁজে, ঘাড়ের নিচে আর কানের পিছনে। তখনই

আবার খেয়াল হল, মেয়েটি কি বলবে বলেছিল যেন, কিন্তু একটি কথাও তো এখনও শুরু করে নি।

চুপচাপ চেয়ারের ওপর বসে আছে। দুটো হাত কোলের ওপর রাখা। একদৃষ্টে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

মনে করিয়ে দিলাম, কি বলবেন বলেছিলেন? আর সময়ও তো নেই। একটু পরেই গাড়ী আপনাদের পৌঁছে দেবার জন্য আসবে।

মেয়েটি নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল। ম্লান হেসে বলল, পরের লেখা কথা বলে বলে নিজের কথা আর কিছুতেই গুছিয়ে বলতে পারি না। অভিনেত্রী-জীবনের তলায় নিজে চাপা পড়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছি। অনেক কথা আজ হয়তো বলবার সময় হবে না, শুধু একটা অনুরোধ আপনাকে কবব।

কি বলুন।

আমার কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে মোটরের হর্ন। প্রেসিডেন্টকে পৌঁছে দিয়ে গাড়ী ফিরে এসেছে। এবার মহিলা-আর্টিষ্ট আর দূরের মেম্বার দু-এক জনকে পৌঁছে দেবে।

আপনি তো বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। কাগজ খুললেই আপনার নাম চোখে পড়ে। প্রতি মাসেই একটা দুটো এ্যামেচার থিয়েটারের ব্যাপারে আপনি থাকেন। আমাকে যদি মাঝে মাঝে সুযোগ দেন। এখন যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি, চড়কের চেয়েও সংয়ের সংখ্যা বেশী। খুঁটির জোর না থাকলে কোথাও ঢোকারও উপায় নেই। দয়া করে যদি আমার কথাটা মনে রাখেন।

এমন কিছু অসঙ্গত আবদার নয়, অন্যায়ও নয়। মেয়েটি অভিনয়ও মন্দ করে না। মেলোড্রামাটিক রোলের পক্ষে ভালই।

ঘাড় নাড়লাম, বেশ, আপনি দিন পনেরো পরে একবার আমাব সঙ্গে দেখা করবেন। আমার ঠিকানাটা,—দাঁড়ান লিখে দিচ্ছি।

দরজাব কাছে এক ভলান্টিয়ার দাঁড়িয়ে ছিল, বোধ হয় আমাদের

ডাকতে এসেছিল, তার কাছ থেকে কলম নিয়ে ঠিকানাটা লিখে মেয়েটির হাতে দিলাম।

নিন, রেখে দিন। অফিসের ঠিকানা দিলাম। টিফিনের সময় মানে একটা থেকে দেড়টার মধ্যে দেখা করবেন।

দু চোখে কৃতজ্ঞতার দীপ্তি। মেয়েটি দু হাতের অঞ্জলিতে ঠিকানাটা নিয়ে ব্লাউজের ফাঁকে রেখে দিল।

মুখে বলল, ধন্যবাদ।

ঠিক দিন পনোরো পর। টিফিনের সময় কাঠি দিয়ে শশার কুচি খাচ্ছি, এমন সময়ে আশেপাশে আলোড়ন। যে দু-এক জন ছোকরা কেরানী টেবিলের ওপর বসে উত্তেজনার মুখে গলার স্বর পঞ্চমে তুলেছিল তারা হঠাৎ কণ্ঠ খাদে নামিয়ে টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। বড়বাবু এই সময়টা চেয়ারের ওপর পদ্মাসনে বসে কয়েকটা আসন করে নেন দ্রুত গতিতে। যোগাভ্যাসের সগোত্র। নিত্য এই প্রক্রিয়ায় যৌবন নাকি স্থায়ী হয়। তিনিও আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন।

আমি চেয়ার ঘোরাতেই দেখতে পেলাম, মেয়েটি সামনে দাঁড়িয়ে। দুটি হাত নমস্কারের ভঙ্গীতে জড়ো-করা।

আপনি দিন পনেরো পরে দেখা করতে বলেছিলেন।—মেয়েটি মোলায়েম কণ্ঠে বলল।

ও, তা, মনে পড়েছে, হাতের শশার কুচিগুলো টেবিলের তলায় চালান দিয়ে ভদ্রভাবে বসবার চেষ্টা করি, আপনি বসুন এই চেয়ারে, আমি দেখছি।

জানালার ধারে অফিসের নাট্যসমিতির সেক্রেটারী দিব্যেন্দু পাল রোদ পোহাচ্ছিল, তাকে পাকড়াও করলাম।

হ্যাঁ রে, তোদের ফিমেল কাস্টিংয়ের মেয়ে সব পেয়ে গেছিস?

হ্যাঁ, বায়না দেওয়া হয়ে গেছে। সামনের মঙ্গলবার থেকে সবাই আসবে। কেন ?

হাতে একটি মেয়ে ছিল।

হাতে মেয়ে, বল কি মানিকদা ? বরাত ঘুরে গেছে বল। হাতের মুঠোয় মেয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ।

রসিকতার কি আর তোদের সময় অসময় নেই।—মৃদু ভৎর্সনা করে দিব্যেন্দুকে থামিয়ে দিলাম। মুখের আগঢাক নেই ছোকরার। তিলকে তাল করতে অদ্বিতীয়।

ঐ সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। গত মাসে আমাদের সঙ্গে একটা বইতে নেমেছিল। প্লে ভালই করে।

দিব্যেন্দু ফিরে দেখল। মেয়েটি তখনও আমার সীটের সামনে একভাবে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু বড় পার্ট তো সবই বুক্‌ড, ছোটখাটো পার্ট কি করতে চাইবেন ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব করবে। কথাবার্তায় মনে হল খুব অভাবে পড়েছে। তুই একবার কথা বলে দেখ।

দিব্যেন্দু কথা বলল। মিনিট পনেরো। ঠিক হল উপস্থিত ছোট একটা বোনের মহলা দেবে। তারপর বড়দের কেউ আসতে নাবাজ হলে, মেয়েটিকে সেই চান্স দেওয়া যাবে।

যাবার আগে মেয়েটি আবার আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

দাদা, আপনার দয়ার কথা জীবনে ভুলব না।

উত্তরে আমতা আমতা করলাম, কিছুই বলতে পারলাম না। মেয়েটির মুখচোখের ভাবে মনে হল, এ পার্টটা পেয়ে যেন বেঁচে গেল। অথৈ জলে কুটো দেখতে পাওয়ার সামিল।

কিন্তু আমার বরাত! নিজের অফিসের থিয়েটার অথচ আমাকে বাইরে থাকতে হল। হঠাৎ নোটিস এসে হাজির। মাস দুয়েকের জন্য পুণায় বদলি। মেজাজ বিগড়ে গেল। মনের মতন

একটা পার্ট পেয়েছিলাম। দাক্ষিণাত্যের সম্রাট! বদলির হুমকিতে সিংহাসন খালি করে ট্রেনে চাপলাম। তবে যাবার আগে এটা দেখে গেলাম যে, মেয়েটি একটি ভাল পার্ট পেয়েছে। মনীষা কুণ্ডুর সঙ্গে দরে পোষায় নি। তিনি আসবেন না, তার পার্টটাই মেয়েটিকে দেওয়া হচ্ছে।

পুণাতেই অভিনয়ের খবর পেলাম, বন্ধুবান্ধবদের চিঠির মারফত। নিজের হাত কামড়ানো ছাড়া আর করবার কিছু ছিল না।

ফিরতেই সবাই ঘিরে ধরল। কে কি ভাবে স্টেজে মাত করে দিয়েছে তারই সরব ফিরিস্তি।

কলরব থামলে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁ রে, ফিমেল পার্ট সব কেমন হল?

ভালই। সবাই তো আজকালকার নামকরা এ্যামেচার এ্যাক্ট্রেস। ওদের পিছনে টাকাও তো কম ঢালা হয় নি।

সেই মেয়েটি কেমন করল, সেই আমি যাকে ঠিক করে দিয়েছিলাম।

আমার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই কেমন একটা অস্বস্তির ভাব সবাইয়ের মধ্যে। উৎসাহের স্রোতে যেন ভাঁটা পড়ে গেল। ভিজে বারুদের মতন সবাই একটু চুপসে গেল।

অভিনয় তো ভালই করে, তবে--

তবে?

না, মানে, একটু যেন কেমন কেমন।

ব্যাপারটা খুলে বলবি তো? ওসব চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বোঝার আমার সাধ্য নেই। কি বলবি খোলাখুলি বল।

মেয়েটি সুবিধের নয়।

কি রকম? একটু আশ্চর্য হলাম। অবশ্য আলাপ এমন কিছু বেশী দিনের নয়, তবে মাস দুয়েকের মধ্যেও তেমন বেচাল দেখি নি। সম্মান রেখেই কথা বলেছে। ওই শুধু অভিনয়ের পরে

সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রার্থনা নিয়ে। এ ছাড়া কোন দিন সে রকম কিছু নজরে পড়ে নি।

আমাদের বিজয়ের সঙ্গে একটু মাখামাখির চেষ্টা হয়েছিল, তবে বিজয় তো সে রকম ছেলে নয়। বিপদটা কেটে গেছে।

বিজয় অবশ্য সত্যিই সে রকম ছেলে নয়। ক্যাশিয়ার। চুপচাপ নিজের কাজ করে যায়। সারা দিনে একবার মাথাও তোলে না, গল্পগুজব তো দূরের কথা।

ওর সংসারের সব খবরই রাখি। বাপ আচমকা মারা গেল। একপাল কাচ্চাবাচ্চা রেখে। ফলে কলেজ ছেড়ে বিজয়কে অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরতে হল চাকরির দরখাস্ত নিয়ে।

বহুকষ্টে এ অফিসের চাকরিটা জুটেছিল। কিন্তু অগস্ত্য-সংসারে এ কটা টাকা তো গণ্ডূষ। বাড়ী গিয়েই পৌঁছত না। গোটা তিনেক টিউশনির শরণ নিল বিজয়। সকালে একটা, বিকেলে অফিসের পর ছুটো। উদয়াস্ত পরিশ্রম। কাজেই মেয়েছেলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার গোলাপী নেশা আর যার থাক, বিজয়ের চোখে অন্ততঃ নেই, এটা আমার বেশ জানা।

কাজেই সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত। তবু কিছু কিছু কথা কানে এল। ছু-এক জন বিজয়কেও একেবারে নির্দোষ বলল না।

বিজয়ের অভিনয় করা ধাতে আসে না, তবে শখ ষোল আনা। চেহারাটা ভাল। সংলাপ কম এমন পার্টে সেজে দাঁড়িয়ে থাকলে মন্দ দেখায় না। সেই রকম একটা পার্টই তাকে দেওয়া হয়েছিল। একটা স্থবিধা—টিউশনি কামাই করে তাকে রিহার্সেল দিতে হবে না। শুধু শনিবার রবিবার একটু দাঁড়ালেই চলবে।

কি করে যে মেয়েটির সঙ্গে ওর আলাপ হল, সে খবর সঠিক কেউ বলতে পারল না। তবে ছুজনকে পাশাপাশি বসে গুজগুজ ফুসফুস করতে প্রায়ই দেখা গেল। ছু-এক দিন

রিহার্সেলের পরে বিজয় মেয়েটিকে বাড়ী পৌঁছে দিতেও গিয়েছিল, এমন নজিরও পাওয়া গেল। তার বেশী কিছু নয়।

যাক, এ নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি না করাই ভাল। ব্যাপার বেশী দূর গড়ায় নি এই রক্ষা।

ব্যাপার কিন্তু গড়াল অন্য দিক দিয়ে। দিল্লী থেকে কর্তারা এসে হাজির। সারা অফিস তোলপাড়। ফাইল ঘেঁটে, কাজকর্মের হিসাবনিকাশ চেয়ে আমাদের অবস্থা মারাত্মক করে তুলল। সব ডিপার্টমেণ্টেই পরিত্রাহি চিৎকার।

গলদ বেরুল ক্যাশে। নগদ দেড় হাজার টাকা কম। বিজয়কে নিয়ে টানাহেঁচড়া, পুলিশের ভয়, চাকরি নেবার হুমকী।

বিজয় সমস্ত স্বীকার করল। কোন কথা লুকাল না।

বহু কষ্টে এক জায়গায় বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। পাত্র বে-সরকারী অফিসের কেরানী। বাপ নেই, কিন্তু জাঁদরেল মামা আছেন। তিনিই অভিভাবক। পানিহাটিতে দেড় কাঠা জমির ওপর নড়বড়ে এক বাড়ী। তাতেই পাত্রের দর উঠল পনেরো শ নগদ। এ ছাড়া অন্য খরচ তো আছেই।

বিজয় ভেবেছিল কোন রকমে পাত্রের মামার হাতে-পায়ে ধরে অবস্থাটা বোঝাবে। বাড়ীর হাল দেখলে পাষাণেব প্রাণ গলে, এ তো মানুষ। কিন্তু ক্যাশিয়ার বিজয় হিসাবে ভুল করেছিল। সব পাত্রের অভিভাবক মানুষ হয় না।

বিজয়ের অবস্থা কাহিল। জানা, অল্পজানা বন্ধুবান্ধব, দূর সম্পর্কের আত্মীয় সবাইকে ধরাধরি, কিন্তু একটা কানাকড়ি দিয়েও কেউ সাহায্য করল না। উল্টে কিছু উপদেশও দিল। যেমন সাধ্য তেমন চেষ্টা করাই উচিত। মগডালের ফুলের দিকে হাত বাড়ালে আপসোস করাই সার হয়। কিন্তু নিজের যেমন অবস্থা, সেই অনুযায়ী পাত্র খুঁজতে হলে বোনকে ফেরি-ওয়ালার হাতেই দিতে হয়। তা তো সম্ভব নয়।

দিনরাত ভেবে ভেবে বিজয়ের পাগল হবার দাখিল। মা স্পষ্ট বলে দিলেন, এই মাসের মধ্যে মেয়ের বিয়ের ঠিক না হলে তিনি আত্মঘাতী হবেন। এত বড় ধাড়ী মেয়েকে আর বাড়ীতে রাখা চলে না। লোকের কথায় কান পাতা যায় না।

অতিষ্ঠ হয়ে বিজয় এ কাজ করল। মনে ভেবেছিল না খেয়ে, না দেয়ে যেমন করে হোক টাকাটা দিয়ে দেবে। দরকার হলে বন্ধুবান্ধবদের পায়ে পর্যন্ত ধরবে। কিন্তু তার আর সময় পেল না। তার আগেই শকুন ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অনেক ভেবে চিন্তে কর্তারা বিজয়কে আর পুলিশের হাতে দিলেন না। ভদ্রলোকের ছেলে—একবার জেলের ছাপ পড়ে গেলে একেবারে তুনিয়ার সব কাজে বরবাদ হয়ে যাবে। তার চেয়ে ছাড়িয়ে দেওয়াই ভাল। ও-টাকাটা অবশ্য কোম্পানীর লোকসানের পাতাতেই লেখা হবে। তবে বিজয় লিখে দিয়েছে, তু বছরের মধ্যে টাকাটা যেমন করে হোক শোধ দেবে।

দিনকতক সারা অফিস জুড়ে হৈ চৈ। কেউ কেউ বিজয়কে বলল, ভিজে বেড়াল। আবার কেউ ওকে সায়ও দিল। অন্যায় কাজে তো আর খরচ করে নি। বোনের বিয়েতে নিরুপায় হয়েই টাকাটা নিয়েছিল, সুযোগ-সুবিধা হলেই রেখে দিত। আবার তু-এক জন পণপ্রথার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতাও করল। তারপর একসময়ে সব থিতিয়ে এল। আবার আগের মতন ঢিমে-তেতালায় চলল সুর।

বেশ কিছুদিন পরে।

সারা রাত গানের জলসা, কিন্তু রাত বারোটা বাজতেই আর ভাল লাগল না। উঠে পড়লাম।

যাদের নাম বিজ্ঞাপনে ছিল, তাঁরা কেউ আসেন নি। আশ-পাশের ছেলেছোকরারা আসর জাঁকিয়ে বসেছে। ওরই ফাঁকে

ফাঁকে দু-এক জন স্বল্পখ্যাত গাইয়ে কিংবা সেতারী এসেছেন। তাদেরই মোহে শ্রোতারা চেয়ার আঁকড়ে বসে আছে।

বেরিয়েই মনে হল ভুল করেছি। এখন বাস ট্রাম পাওয়া দুষ্কর। আস্তানাও কাছাকাছি নয়। তবু ভাবলাম বেরিয়ে যখন পড়েছি, তখন আর ফেরা নয়। বড় রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিলেই হবে।

গলি নয় উপগলি। দু পাশে পাঁজরসার বাড়ীর জটলা। নোনা-ধরা, সুরকি-খসা। আদি কলকাতার খানিকটা। জোড়-পায়ে পার হতে গিয়েই বাধা পেলাম।

আসুন বাবু।

চোখ তুলেই পিছিয়ে এলাম।

পাতলা সাড়ী, সস্তা ছিটের ব্লাউজ, পাউডারের প্রলেপ, কাঁচ-পোকার টিপ, কিন্তু এসব সত্ত্বেও চিনতে অসুবিধা হল না।

গম্ভীর গলায় বললাম, বাঃ, চমৎকার!

গলার আওয়াজ শুনে সেও চমকে উঠল। এক পা এক পা করে সামনে এসে নিরীক্ষণ করল। চোখ কুঁচকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখল, তারপর ধরাগলায় বলল, দাদা!

আভাসে মনে হল প্রণাম করার জন্য এগিয়ে আসছে, জোড়পায়ে সরে এসে তার সে চেষ্টা ব্যর্থ করলাম। গলার স্বরে যতটা সম্ভব তিক্ততার রেশ মাখিয়ে বললাম, সর, পথ ছাড়।

মেয়েটি কেঁদে ফেলল, আমায় ভুল বুঝবেন না দাদা! আপনাব ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না।

শোধ তো অনেকটাই করে ফেলেছ। নিজের চড়া কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে উঠলাম।

মেয়েটি মাথা নিচু করে রইল। অনেকক্ষণ মুখ তুলল না।

পাশ কাটাতে গিয়েই বাধা পেলাম। মেয়েটি হুমড়ি খেয়ে পায়ের ওপর পড়েছে। সরবার নাম নেই।

আপনি বিশ্বাস করুন। এ ছাড়া বাঁচবার আর কোন পথ ছিল না।

পথ হয়তো ছিল না, কিন্তু গঙ্গায় জল তো ছিল।

শুধু আমি নিজে হলে ভাবনার কিছু ছিল না।

মেয়েটি থেমে গেল।

মাঝরাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বারনারীর জীবন-কাহিনী শোনার কৌতূহল কম। তবে যেভাবে মেয়েটি পথ আটকেছে, তাতে সহজে রেহাই পাব, এমন সম্ভাবনাও দেখছি না।

একটু আসবেন দাদা, এক মিনিটের জন্য ?

তোমার ঘরে ? বিরক্ত গলায় উত্তর দিই।

না দাদা, ঘরে ডাকবার সাহস আমার নেই। সারা গায়ে পাঁক মেখেছি, তার উৎকট গন্ধে নিজেরই দম বন্ধ হয়ে আসছে। একটু শুধু চৌকাঠের কাছে দাঁড়াবেন।

এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম। না, নিশুতি রাত। এমন সময়ে চেনাজানা লোকের নজরে পড়ার আশা কম। কিছু কিছু আগ্রহও হচ্ছে। একবার উঁকি দিয়ে দেখতে আর ক্ষতি কি !

মেয়েটির পিছন পিছন এগিয়ে গেলাম। অন্ধকার ঘর। স্যাঁতসেঁতে। সুইচ টিপতেই ম্লান আলোর ছটা। এ পাশের শিকল তুলে দেওয়া দরজাটা সাবধানে খুলে দিতেই এ ঘরের আলো ও ঘরে গিয়ে পড়ল। ম্লান আলো কিন্তু দেখতে অসুবিধা হল না। ঢালা বিছানা। সার সার শুয়ে রয়েছে।

প্রথমে বিজয়, তারপর পর পর গোটা তিনেক। গায়ে ছেঁড়া কাঁথা। পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছে।

আপনার তো খুব চেনা। পরিচয় দেবার আর চেষ্টা করব না। ওঁর মা সতীসাধ্বী। আমার রোজগারের অন্ন মুখে তোলবার আগেই দেহ রেখেছেন।

বিজয় ! গলার আওয়াজটা একটু জোরেই হয়ে গেল।

হাঁ, মেয়েটি হাসল। আপনারা তো বিচার করে তাড়িয়ে দিয়েই খালাস। এমন একটা অপবাদের বোঝা মাথায় থাকার দরুন কোথাও বেচারীর সামান্য একটা চাকুরিও জুটল না। ভাইগুলো অস্থিচর্মসার। নিজেও তাই। একদিন এক পার্কে দেখা হয়ে গেল। কোন কথা শুনলাম না। জোর করে তাকে আর ভাই-ক'টাকে টেনে নিয়ে এলাম। অবশ্য না নিয়ে এলে বাড়ীওয়ালা তার পরের দিনই বাড়ী থেকে বের করে দিত।

মেয়েটি থামল। আমি একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। অন্ধকারে মুখটা দেখা গেল না। অস্পষ্ট একটা শরীরের কাঠামো। কাঁচপোকার টিপটা জ্বল জ্বল করছে।

ক'টাই বা সোনাদানা গায়ে ছিল, শেষ হতে মোটেই দেরি হল না। তারপর কোথাও একটু আলোর আঁচড় পেলাম না। অথচ এতগুলো প্রাণী। আপনার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার মুখ নেই। এ্যামেচার পার্টিতেও পাত্তা পেলাম না। ধাপে ধাপে এই পথে নেমে এলাম। এ ছাড়া ওদের বাঁচাবার আর কোন উপায় খুঁজে পেলাম না দাদা। ভাবলাম, নিজের গায়ে কাদা লাগুক, ধুলো লাগুক, তবু যদি ওরা বাঁচে। ওরা নিজের পায়ে ভর দিয়ে এক দিন দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া অফিসের টাকাটাও তো শোধ দিয়ে দিতে হবে।

দু হাতের তালুতে মুখ ঢেকে মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আমি আর অপেক্ষা করলাম না। পায়ে পায়ে পিছিয়ে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়ালাম। এখনও চাপ চাপ অন্ধকার। ভোর হতে অনেক দেরি।

কিন্তু তবু এগিয়ে যেতেই হবে। মুখ ফেরালেই রংমাখা, কাজলের টিপপরা, শস্তা দামের শাড়ীজড়ানো আর-এক জনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। আমাদের কাজের বোঝা মাথায় নিয়ে যে অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে।

॥ মূর্তি ॥

স্যার আর্থার হোবার্টের হাঁটুর ওপর পা দিয়ে উঠে খুব সাবধানে তাঁর কাঁধের দু পাশে পা ঝুলিয়ে বনমালী বসল। বাঁশের মাচায় বাঁধা টিন থেকে পালিশ তুলে নিয়ে সজোরে ঘষতে লাগল। প্রথমে দুটো গাল তারপর কানের পিছন দিক।

বছরে মোটে একবার করে কর্তাদের এদিকে নজর পড়ে। মূর্তি ঘিরে বাঁশের মঞ্চ। শুকনো কাপড় দিয়ে প্রথমে গোটা মূর্তিটা মুছে নিতে হয়। পরিষ্কার করে ফেলতে হয় পাখপাখালীর সারা বছরের অত্যাচার। তারপর পালিশ ঘষে ঘষে উজ্জ্বল করে তুলতে হয়। কোথাও ছিটেফোঁটা ময়লা না থাকে।

শুধু এই একটা নয়, আশপাশের প্রায় পাঁচ-ছটা মূর্তি পরিষ্কার করবার ভার বনমালীর ওপর। দিন দশেকের মধ্যে সব কাজ সেরে ফেলতে হয়। একটু দেরী হলে কণ্ট্রাক্টরবাবুর মুখনাড়া আছে, গা-জ্বালানো কথার ফুল্‌কি। কথায় কথায় টাকা কাটবার হুমকি।

সব কাজ শেষ করে বনমালী স্যার আর্থারের গায়ে হাত দেয়। কাজ শুরু করবার আগে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে মূর্তিটা। সারা শহরে এমন জীবন্ত মূর্তি আর একটাও নেই। অন্ততঃ বনমালীর তাই ধারণা। একটা হাত সামনের দিকে প্রসারিত। ঋজু সুঠাম শরীর, সারা দেহে আভিজাত্যের নিশানা। আশ্চর্য হয়ে বনমালী দেখে। চোখের চশমাটা পর্যন্ত আসল বলে ভুল হয়। কোটের ভাঁজগুলো অবধি প্রাণবন্ত। স্যার আর্থারের সম্বন্ধে আরো অনেক খবর বনমালী যোগাড় করেছে। এ শহরের সর্বময় কর্তা ছিলেন এক সময়ে। তাঁকে বাদ দিয়ে

কোন ভাল কাজ হত না। সব কিছুতে তাঁর মঙ্গল হাতের ছাপ। সরকারী হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ এমন কি নারী সীবনালয় পর্যন্ত তাঁর আনুকূল্যে পুষ্ট, তাঁর দাক্ষিণ্যে মহিমান্বিত।

অন্য সব মূর্তিগুলো বনমালীর তেমন পছন্দসই নয়। কেমন বেয়াড়া সব ভঙ্গী, উদ্ধত ধরণ। কেউ ঘোড়ায় চেপে তলোয়ার খোলেন নি বটে, কিন্তু মুখচোখের ভাবে তলোয়ারেব তীক্ষ্ণতা। কঠিন মাংসপেশী মুখের, ভ্রূকুটি কুটিল। কিন্তু এমন শান্ত সমাহিত মুখের ভাব কোন মূর্তির দেখে নি বনমালী, কোথাও নয়। খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন স্যার আর্থার এ খবরও বনমালীর জানা। শহরের বাইরে ছোট এক বাংলো শালবন ঘেরা, সেই স্যার আর্থারের আস্তানা ছিল। সারা ঘরে, টেবিলে, তাকে ছড়ানো থাকত বইয়ের রাশ। মাঝখানে বসে তিনি পড়াশোনা করতেন। এসব কথা বনমালী নিজের কানে শুনেছে।

মূর্তিটা পরিষ্কার হয়ে যাবার পরই দলে দলে স্কুলের ছেলেরা এসে জোটে। মাষ্টাররাও থাকেন ফাঁকে ফাঁকে। চারপাশের জমি ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে হয়ে ওঠে। বিরাট চাঁদোয়া, রঙীন কাগজে জড়ানো বাঁশের থাম। মূর্তির গলায় মোটা ফুলের মালা। হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান শুরু হয়, গান থামলেই বক্তৃতা। জাঁদরেল এক মাষ্টার ইনিয়ে বিনিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চেঁচান। গালভরা সব কথা। দূরে দাঁড়িয়ে বনমালী উৎকর্ণ হয়ে শোনে। প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে।

দেহের মধ্যে যেমন প্রাণ, তেমনি এই সরোজিনী হাইস্কুলের প্রাণ ছিলেন স্যার আর্থার হোবার্ট। প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন স্কুলের ছেলেদের। স্বনামে বেনামে কত সঙ্গতিহীন ছাত্রকে যে সাহায্য করতেন তার ইয়ত্তা নেই। শুধু বইপত্রই নয়, জামা-কাপড়ও জোটাতেন অনেককে। আজও সে ভালবাসা বুঝি একটুও ক্ষীণ হয় নি। তাই আজও চেয়ে আছেন সরোজিনী

হাইস্কুলের দিকে, হস্ত প্রসারিত করে আছেন এই শিক্ষায়তনের সৌধের দিকেই।

বনমালী আরো একটু পালিশ তুলে নিল, তারপর মসৃণ চওড়া কপাল আর চিবুক বেশ করে ঘষতে লাগল। এই নিয়ে ওর সঙ্গীরা খুব হাসাহাসিও করে। এই মূর্তিটার ওপর বনমালীর যে বেশ একটু দরদ, সেবাযত্নের অন্ত নেই তা কারুর চোখ এড়ায় না। সঙ্গীরা বলে, বনমালী, আগের জন্মে বোধ হয় এ লোকটা তোর কেউ ছিল রে। তুই এমনভাবে পালিশ ঘষিস্, মনে হয় যেন নিজের দাদুকে তেল মাখাচ্ছিস্।

বনমালী এসব হাসি টিটকারির কোন উত্তর দেয় না। মাথা নিচু করে নিজের কাজ করে যায়। ফাঁকে ফাঁকে কথাটা মনে করে। আগের জন্মে কেন এ জন্মেই যদি ইনি বনমালীর কেউ হতেন। সরোজিনী হাইস্কুলের ছাত্রদের মতন, অমনি ভাল-বাসতেন প্রাণ ঢেলে। প্রয়োজন মত পড়ার খরচ যোগাতেন, মাইনে আর বইখাতা। তাহলে বনমালীর জীবনের মোড় ফিরে যেত। একমুঠো ভাতের জন্য আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে এত দূরে এমন একটা জীবিকা বেছে নিতে হত না।

গণ্ডগ্রাম। বালেশ্বর থেকে মাইল ত্রিশেক। ছোট্ট এক কুঁড়ে, মাটির দাওয়া আর বাঁশের খুঁটি। জ্ঞান হয়ে অবধি একই দৃশ্য দেখেছে বনমালী। বাপ বাতে আর হাঁপানীতে পঙ্গু। চলাফেরা করবার সাধ্য নেই। দেয়ালে হেলান দিয়ে সারাটা দিন কাতরান। রাত্রেও নিস্তার নেই। আবছা অন্ধকারে ঘুম থেকে জেগে উঠে বনমালী কতদিন দেখেছে, দু হাতে বুক চেপে ধরে বাবা টাল সামলাচ্ছেন। প্রাণান্তকর অবস্থা। মার সাড়া নেই। ভোর থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা খাটুনি। মাঠে ধান কাটার সাহায্য করা, তারপর সেই ধান মাথায় করে লোকের বাড়ীর উঠানে পৌঁছে দেওয়া। সেখানেই শেষ নয়, কয়েকটা

বাড়ীতে আবার ঢেঁকিশালেও কাজ করতে হত। কিন্তু এত খাটুনির বদলে যা আহরণ করতেন তাতে পাঁচটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন তো দূরের কথা, অনশনও ঠেকানো যেত না।

ছেলেবেলা থেকে লেখাপড়া শেখার খুব শখ বনমালীর। বাবুদের ছেলেদের মতন সাইকেল চেপে শহরে পড়তে যাবে এ সাধ তার আজন্মের। গাঁয়ের টোলে শিক্ষা শুরু হয়েছিল কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। কাজ করবার মতন একটু বড় হতেই মার সঙ্গে মাঠে যেতে হয়েছিল। পুঁথি মুখে দিয়ে পড়ে থাকলে চলবে কেন। তবু বাড়ীতে দুটো হাতে যতটা কাজ করা যায়। বাড়তি হাত বাড়তি রোজগারে লাগাতে হবে বৈকি। যেদিন টোল ছাড়তে হল সেদিন সারাটা রাত বনমালী কেঁদেছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

ছেঁড়া মেঘের মতন ছেঁড়া ঘটনার টুকরো। সংসারে লোক আর বাড়ল না কিন্তু আহাবের পরিমাণ বাডল। শতছিন্ন জামা-কাপড়ে আর ভাইকে ঢেকে রাখা যায় না, বোনকে তো নয়ই। পাঁচজনের পরামর্শে বনমালী শহবে এল। গাঁয়ের জানাশোনা একজন কোন অফিসে বেহারাগিরি করত, তাকেই সম্বল করে।

মাস ছয়-সাত দরজায় দরজায় ঘোরাঘুরি। সঙ্গে আনা সম্বল সব নিঃশেষ। দেশে ফিরে যাবে কি-না ভাবছে বনমালী, এমন সময়ে গাঁয়ের পুরন্দরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে-ই চেষ্টা-চরিত্র করে এ কাজটা জুটিয়ে দিল। মাস কয়েক বিনা-মাইনেয় শিক্ষানবিশী করতে হয়েছিল। শুধু মূর্তি পালিশ নয়, তাহলে বছরের অর্ধেক দিন না খেয়ে কাটাতে হত, সেই সঙ্গে ছুটকো-ছাটকা আরো নানান রকমের কাজ।

কিন্তু মূর্তি পালিশ করা, তাতে তেল লাগিয়ে ঝক্‌ঝকে করে তোলা এ কাজেই বনমালীর উৎসাহ বেশী। বিশেষ করে স্যার আর্থার হোবার্টের মূর্তির কাছে আসতে পেলে যেন বেঁচে যায়।

এ মূর্তির সান্নিধ্যে এসে নিজের ছোটখাটো সুখদুঃখ, ব্যথাবেদনা সব ভুলে যায়।

বছরের এই সময়টার জন্য বনমালী পথ চেয়ে বসে থাকে। অন্য সময়ও হাতে কাজ না থাকলে বনমালী এ পথে ঘোরাফেরা করে। শুধু হাটবার বাদ দিয়ে। বুধবারে এখানে হাট বসে। গরুর গাড়ী করে তরিতরকারি ফলমূল শুধু নয়, তাঁতের কাপড়, গামছা নিয়ে দূর দূরান্ত থেকে লোক আসে। তা আসুক, তাতে বনমালীর বলার কি থাকতে পারে, কিন্তু ব্যাপারীরা তা বলে স্যার আর্থার হোবার্টের প্রসারিত ডান হাতের ওপর অমনি করে গামছা সাজাবে! তাঁর পায়ের তলায় ঢালবে স্তূপীকৃত আলু পেঁয়াজ! অথচ এধারে ওধারে পুলিশ ঘোরে। হাটবারে তাদের আমদানি যেন একটু বেশীই। একটি কথাও বলে না, এদিকে নজরও দেয় না।

মূর্তির দুটি গাল ঘষতে ঘষতে বনমালী হঠাৎ থেমে গেল। ভুল দেখছে নাকি! চোখ কুঁচকে মাথাটা আরো সরিয়ে নিয়ে এল। না, ভুল তো নয়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দু চোখের নিচে জলের দুটি বিন্দু।

বাঁশের মাচা বেয়ে বনমালী তরতর করে নিচে নেমে এল। একটু দূরেই কন্ট্রাক্টরবাবু দাঁড়িয়ে আছে সাইকেলে হেলান দিয়ে। তার সামনে এসে দাঁড়াল।

বাবু।

কিরে?

একটা কথা।

কথাটা কি বনমালী বলল। শুনে কন্ট্রাক্টরবাবুর হাসি আর থামে না। সাইকেলের সিটে ভর দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাসল, তারপর হাসি থামিয়ে বলল, তুমি মাথায় জল দিয়ে এস বনমালী। তোমার মাথা গরম হয়েছে।

তার মানে ?

মানেটাও কণ্ট্রাক্টরবাবু বুঝিয়ে বলল। ব্রোঞ্জের মূর্তির আবার কান্না হাসি। ভোরের শিশির জমে ওই রকম মনে হচ্ছে কিংবা পালিশের তেলেই চিকচিক করছে।

পালিশের তেল তো নয়ই। ভোরের শিশির ? বনমালী চারদিকে চেয়ে দেখল। ঘাসে পাতায় কোথাও শিশিরের ছিটে-ফোঁটা নেই। এত চড়া রোদে শিশির থাকে কখন। শিশির নয়, চোখেরই জল।

আচমকা কণ্ট্রাক্টরবাবুর ধমকানিতে বনমালীর চমক ভাঙল।—যাও, যাও, কাজ শেষ কর তাড়াতাড়ি। আজ দুপুরের মধ্যে সব ফিনিস করে ফেলতে হবে।

বনমালী মাচা বেয়ে আবার ওপরে উঠল।

কিন্তু চোখের জল কেন ? যতদূর শুনেছে বনমালী, তিন কুলে স্যার আর্থারের কেউ নেই। একমাত্র ছেলে লড়াইয়ে মারা গেছে জাহাজডুবি হয়ে। দুঃখ কি তারই জন্য! কিন্তু বক্তৃতা শুনে বনমালী এতদূর বুঝেছে ছেলে অশিক্ষিত বলে স্যার আর্থারের নাকি আপশোসের অন্ত ছিল না। শুধু অশিক্ষিতই নয়, দুর্বিনীত, দুশ্চরিত্র। বাপের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি ছিল না, চিঠির পাঠ তো নয়ই। তবে, কিসের এত দুঃখ স্যার আর্থারের।

নিজের ছেলে সরে দাঁড়িয়েছিল বলে দুনিয়ার সব ছেলেকে কাছে টানার চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষ করে সরোজিনী হাই-স্কুলের সব ছাত্রকে। টিফিনের সময় নিজে এসে দাঁড়াতেন ছেলেদের মাঝখানে। ঘর থেকে বয়ে-আনা খাবার তাদের মধ্যে বিলি করতেন। গল্পচ্ছলে নানা উপদেশ দিতেন। শিক্ষার আদর্শ, বলিষ্ঠ জীবনের প্রেরণা।

রোদটা একটু চড়া হতেই বনমালী নেমে পড়ল। কণ্ট্রাক্টরবাবু ধারে কাছে নেই। বোধ হয় অন্য কাজ তদারক করতে গেছে।

রাস্তার কল থেকে বনমালী একটু জল খাবে।, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ।

একটু এগিয়েই বনমালী দাঁড়িয়ে পড়ল। জনতিনেক ছাত্র এসে বসল ঘাসের ওপর। কোলের ওপর বই ছড়িয়ে সিগারেট ধরাল। সরোজিনী হাইস্কুলের ছেলে। ক্লাস পালিয়ে এসেছে। বয়স চৌদ্দ-পনেরো, এরই মধ্যে নেশায় পোক্ত সেটা সিগারেট ধরানোর কায়দাতেই মালুম হয়।

নে যাবি তো চল। এখন লাইনে না দাঁড়ালে টিকেট পাওয়াই দায়।

কিন্তু অনুকুলবাবুব ক্লাস বয়েছে যে!

আবে বাখ তোর অনুকূলবাবুর ক্লাস। সে তো সারা বছরই রয়েছে, কিন্তু 'কলঙ্কিনী'র আজ শেষ শো। আজ মিস্ করলে দেখাই হবে না।

কথার মাঝখানেই ছেলেটি থেমে গেল। বাস্তার দিকে চেয়ে বলল, আবে তাপস যে! ক্লাস পালিয়ে এদিকে কোথায়? চাঁদিনী সিনেমায় বুঝি?

তাপস ঘাড় নাড়ল, দূব সিনেমা-ফিনেমা কি দেখব, ওসব তো মবা ব্যাপাব। সার্কাস তাঁবু ফেলেছে স্টেশনেব মাঠে। দি গ্রেট ইণ্ডিযান সার্কাস। ছটোয় আবম্ভ। এখন না গেলে ঢোকাই যাবে না।

একটি ছেলেব গলায় ক্ষীণ প্রতিবাদেব সুব, কিন্তু অনুকূলবাবুব ক্লাস? সবাই যদি চলে যাই -

সমবেত চীৎকারে ছেলেটির গলা তলিয়ে গেল।

পায়ে পায়ে সরে এসে বনমালী আবার মাচাব ওপর উঠল। কন্ট্রাক্টরবাবু কিছুই জানে না। ভোবের শিশির তো নয়ই পালিশের তেলও নয়। জমাট অশ্রু।

ছেঁড়া কাপড়েব টুকবো দিয়ে জলেব ফোঁটা মুছিয়ে দিতে

গিয়ে নিজেই বনমালী হু হু করে কেঁদে ফেলল। চোখের জলের ফোঁটাই না হয় মোছাল কিন্তু স্যার আর্থারের দুঃখ ঘোচাবে কি করে! পালিশ ঘষে ঘষে মূর্তির বাইরেটাই না হয় চকচকে করে তুলবে কিন্তু কি ভাবে দূর করবে তাঁর অন্তরের দৈন্য, তাঁর ব্যর্থ-সাধনার বেদনা।

॥ অশ্বমেধ ॥

ঘোড়ার মুখ ধরে লতিফ সাবধানে বাঁশের বেড়া পেরিয়ে এল। এই হয়েছে এক আচ্ছা জ্বালাতন। আগে দেখতে শুনতে হত না এত। ঘোড়াকে ছেড়ে দিলেই হত। অফুরন্ত মাঠ, বেড়ার বাঁধন নেই। কচি কচি ঘাসে-ঢাকা বেওয়ারিশ জমি। কিন্তু এখন একটু এদিক ওদিক হলেই মুস্কিল। থানা পুলিশের ভয় দেখায় মানুষ। কথায় কথায় চোখ রাঙিয়ে তেড়ে আসে। ভাবতেও লতিফের আশ্চর্য লাগে। কোথায় ছিল এরা। যত উটকো লোক পিঁপড়ের সাবের মতন পিল পিল করে এসে জমিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে। বাছবিচার নেই। নাবাল জমি, এঁদো-পড়া ডোবা; কাশফুলে-ভরা এবড়ো খেবড়ো জমি সব বায়না হয়ে গেল। শুধু বায়না, সঙ্গে সঙ্গে মাটির দেয়াল আর টিনের ছাদ-দেওয়া সারি সারি বাড়ী উঠল। কঞ্চি ঘিরে জমির সীমানা। মাটি কুপিয়ে লাউ, শশা, বেগুন ক্ষেত। পাঁচ বছরের মধ্যে। ভোল ফিরিয়ে ফেলল জায়গাটার।

অথচ লতিফ তো জানে কি ছিল এই শিবানীপুর। একেবারে ভেতর দিকে মাঝারি গোছের গ্রাম। কয়েক ঘর বামুন কায়েতের বাস। পিচ-ঢালা এমন চওড়া রাস্তা হয় নি তখন। কাঁচা মাটির পথ। মাসের অর্ধেক দিন ঘোড়ার গাড়ীর চাকা যেত বসে। সোয়ারীশুদ্ধ সে এক আচ্ছা বিপদ।

কিন্তু তবু সে ছিল অনেক ভাল। পিচ-ঢালা রাস্তা হওয়া তো নয়, খাল কেটে কুমীর আনা।

লাগামশুদ্ধ ঘোড়াটাকে টানতে টানতে লতিফ রাস্তার ধারে নিয়ে এল। ঝুঁকে-পড়া বটগাছের ডালে লাগামটা জড়িয়ে নিজে

বসল গাছের ছায়ায়। আপনার মনে বিড় বিড় করল কিছুক্ষণ ধরে। সবই নসিব, নইলে আর এমনটি হবে কেন। যখন দানা কিনে খেতে দেবার ক্ষমতা ছিল তখন ঘাসও ছিল অফুরন্ত। এমন পাঁজর-বের-করা হাড়সার চেহারা ছিল না মকবুলের। নামটা লতিফ বার দুয়েক ফিস ফিস করে আওড়াল। বড়ো শখের নাম। সুলতানপুরের মেলা থেকে মকবুলকে লতিফ কিনেছিল। ঘোড়া তো নয় যেন জিনের বাচ্চা! দৌড়োয় না ওড়ে। মাটিতে খুর ঠেকে কি ঠেকে না। একবার আড়চোখে মকবুলের দিকে চেয়ে দেখল লতিফ। ইঁটের পাঁজার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা ঘাস দেখা দিয়েছে। সতেজ সবুজ নয়, কেমন ফিকে রং। মকবুল মনের সাধে তাই চিবোচ্ছে।

মিনিট দুয়েক। তারপরই রাস্তার বাঁকে ধুলোব ঘূর্ণি দেখা গেল। পরিচিত শব্দ। আওয়াজ এগিয়ে এল ক্রমশঃ। দাঁত কিড়মিড় করে লতিফ উঠে পড়ল। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসবার যো আছে হারামিদের জ্বালায়। পনেরো কুড়ি মিনিট অন্তব এই এক আপদ হয়েছে।

লতিফ উঠে মকবুলকে নামিয়ে নিয়ে গেল রাস্তার পাশে ঢালু জমি বেয়ে। কিছু বলা যায় না মকবুলের ওপর দিয়েই চালিয়ে যাবে হয়তো। এই কিছুদিন আগেই তো একটা কুকুরের দুটো ঠ্যাং বেমালুম কেটে উড়িয়ে দিল। শয়তানের চর।

কলকব্জার প্রচুর শব্দ করতে করতে বাসটা চৌমাথায় এসে পৌঁছাল। বাস বোঝাই। ছাদের ওপর পর্যন্ত তরিতরকারির ঝুড়ি। একটা লোক রড ধরে ঝুঁকে অনবরত চেঁচাচ্ছে, শিবানীপুর। দু-আনা টিকিট খতম। চৌমাচানীতে কে নামবে নেমে পড়। জলদি।

নামল। জন চার-পাঁচ। গামছা লুঙ্গির বাণ্ডিল দু-এক জনের হাতে, কারুর মাথায় দুধের বালতি। মোহনতলা ফেরত। এদেশের

লোকের ভাষায় মউনিতলা। লোকগুলো মাটি ছোঁবার সঙ্গে সঙ্গে বাস চালু হল।

গোবিন্দপুর, গোবিন্দপুর, চাঁপড়া কঠন মিল, ধানুচি, গোবিন্দপুব। রাজ্যের ধুলো উড়িয়ে বাস অদৃশ্য হল।

লতিফ অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল সেই দিকে। চোখ ফেরাল না। দুশমন, রুজি কেড়ে নিয়েছে লতিফের। মকবুলের সর্বনাশ করেছে।

বেশী দিনের কথা নয়। বড় জোর বছর দশেক। এ রাস্তার একচ্ছত্র নবাব ছিল লতিফ। লখিমপুর থেকে শিবানীপুর বাজার পর্যন্ত অবাধ গতি। শিবানীপুর বাজার থেকে অবশ্য ট্রাম ছিল, সোজা চলে যেত শহরে। লতিফই বাবুদের গাড়ী ধরিয়ে দিত দিনের পর দিন। এ কথাটাও সত্যি তখনকার লোক এখনকার মানুষদেব মতন এমন হুট করে গাড়ীতে চড়বার জন্য পা বাড়াত না। ভাবি বাজারেব ঝুড়ি, জিনিস বোঝাই থলি মাথায় কাঁধে করে অনায়াসে মাইলের পর মাইল পাড়ি দিত।

কিন্তু ওব ঘোড়াব গাড়ীর খদ্দেরই ছিল আলাদা। চৌধুরীদের বুড়ো বাবু। মাসে একবার পেন্সন আনতে যেতেন। সঙ্গে যেত বাবুব বড় ছেলে। সেই বিশেষ দিনটায় গাড়ী আর ঘোড়ার চেহাবাই বদলে ফেলত লতিফ। গদিগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে সাফ করে বাখত, গাড়ীর বাইরেটা মুছত যত্ন করে। আর মকবুলের কি সাজ! মাথাব ওপরে জোড়া কদমফুল, কিংবা কদমফুলের মরশুম না হলে অন্য কোন ফুলের গোছা। নিজেও লতিফ একটু সেজে নিত। ওর সাজা আর কি। দুকানে তুলোয় করে সস্তা দামের আতর আর ওর বাপের রেখে-যাওয়া সাত-তালি-দেওয়া চাপকানটা চড়াত গায়ে। হোক সাত তালি দেওয়া, তবু ওর ইজ্জতই আলাদা। লক্ষ্ণৌ থেকে ওর নানী ঈদে দিয়েছিল ওর বাপকে। এমন মোলায়েম কাপড় এদিকে পাওয়া সোজা কথা!

বুড়োবাবু এসেই গাড়ীতে উঠতেন না, দাঁড়াতেন মকবুলের সামনে। তার ঘাড়ে আলতো চাপড় মেরে বলতেন, মকবুল! ঠিক পারবি তো নিয়ে যেতে?

মকবুল বুঝি বুঝতে পারত বুড়ো বাবুর কথা। সজোরে পা ঠুকত মাটিতে, দুটো কান শক্ত করে। তারপর নাক দিয়ে অদ্ভুত এক শব্দ করত। কিন্তু কথা রাখত মকবুল। পিঠের ওপর আলতো চাবুকের ছোঁয়া পড়তেই গাড়ী শুদ্ধ উড়ে চলে যেত। ঘাড় বেঁকিয়ে চলার কায়দাই আলাদা। পথ-চলতি লোকেরা সরে যেতে পথ পেত না। ঠিক আজ যেমন করে লতিফ সরে আসে বাসের আওয়াজ পেয়ে।

শুধু বুড়োবাবুই নয়, শহরের বাবুরা আসতেন বাগানবাড়ীতে। কেউ কেউ টানা মোটরে আবার দু-এক জন ট্রাম থেকে নেমে লতিফের গাড়ীতে উঠতেন। গাড়ীতে ধরত না অনেক সময়ে। তবলা জোড়া কিংবা খাবার দাবারের পোঁটলা লতিফের পাশে গিয়ে উঠত। বাগানবাড়ীর সামনে সারা রাত খাড়া থাকত গাড়ী। লতিফ চাকর বাকরদের সঙ্গে আলাপ করে নিয়ে হলঘরের কোণে উঁকি ঝুঁকি দিত। তবলার সঙ্গে নূপুরের মিঠে বোল। কি গলা, কি জরিদার ঘাগড়ার ঝলকানি। সারাটা রাত কোথা দিয়ে যে কেটে যেত খেয়ালই থাকত না। মকবুলের পিঠে পুরু চট একটা পেতে দিয়ে ঘাসের গোছা ছড়িয়ে দিত সামনে। আশ্চর্য ঘোড়া। পা ঠোকা নয়, চেঁচানি নয়, সারাটা রাত একভাবে দাঁড়িয়ে মকবুলও যেন আনোয়ারী বাঈয়ের গান শুনত।

লতিফ কচুবনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। সব পালটে গেছে। মাটি, মানুষ দুই-ই। বাবুদের বাগানবাড়ীটায় লড়াইয়ের সময় লালমুখো গোরার পাল এসে আস্তানা বেঁধেছিল, এখন টিনের কারখানা হয়েছে।

অবশ্য আগের দিনে অসুবিধা যে একদম ছিল না এমন নয়।

সে কথা মনে পড়লে হাসি আসে লতিফের। হাড় জির জির পাঁজর-সার ঘোড়া, ছুটবে কি, দাঁড়াতে গেলেই পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়। পিঁজরাপোল থেকেই সরিয়ে আনা বোধ হয়। গাড়ীর অবস্থাও তাই। গাড়ী আর এই পক্ষীরাজের মালিক ছিল ইয়াকুব চৌধুরী। এখন যেখানে ছেলেমেয়েদের স্কুল হয়েছে, আগে সেখানটায় ছিল ঘন বাঁশঝাড়। দিন দুপুরে ঝিঁঝিঁ ডাকত। হেলে-পড়া যজ্ঞি ডুমুরের গাছের পাশে ইয়াকুব গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সারা শিবানীপুরে শুধু লতিফের গাড়ীই আনাগোনা করবে এই বা কেমন কথা। মিউনিসিপালিটীর অফিস থেকে 'লাইসেন' করিয়ে দাঁড়ালেই হল। তারপর সোয়ারী পাওয়া, সে তো নসিব।

কিন্তু ইয়াকুব টিঁকতে পারে নি বেশী দিন। সেদিনের কথা মনে হলে আজও হাসি চাপা দায় হয়ে পড়ে লতিফের।

বাড়ুয্যেদের বুড়ি। চেহারা যাই হোক, নামের বহর ছিল। লবঙ্গলতিকা। পাড়ার লোকের নবু ঠাকুমা। তীর্থ করে ফিরল, সংগে একগাদা পোঁটলা আর চুবড়ি। তিনখানা গাড়ীর মাল। তাও লতিফ না হয় গাড়ীর মাথায়, পিছনে, পাদানিতে বোঝাই করে নিত। কিন্তু দরে পোষাল না। আট আনায় ওই অত লট-বহর আর আড়াই মাইল রাস্তা। লতিফ ঘাড় নেড়েছিল। পারবে না। অন্য চেষ্টা করুন ঠাকরুণ।

ঠাকরুণ অন্য চেষ্টাই করেছিল। একটু এগিয়ে ইয়াকুবের গাড়ী ভাড়া করেছিল। কিন্তু ওই ভাড়া করাই সার। বিশ গজ যেতে না যেতেই গাড়ী কাত হয়ে পড়েছিল সোয়ারী সমেত। নবু ঠাকরুণ পোঁটলা-পুঁটলীর তলায়। মাটি ধ্বসে চাকা সরে গিয়েছিল। ইয়াকুব অবশ্য চট করে নেমে পড়ে গাড়ী ঠিক করে নিয়েছিল। কিন্তু নবু ঠাকরুণের চেঁচামেচিতে ইয়াকুব নিজে

কাত হয়ে পড়েছিল। তারপর আর বেশী দিন শিবানীপুরে থাকতে পারে নি। গাড়ী নিয়ে রাতারাতি সরে পড়েছিল।

আরো বাধা এসেছিল। গোবিন্দ ঘোষালের বড় ছেলে অনন্ত ঘোষাল। বিদেশে ব্যবসা করে বেশ কিছু জমিয়ে ছিল। বাড়ী ফিরল আনকোরা টম টম গাড়ী কিনে। কালো বার্নিস-করা গাড়ী আর চকোলেট রংয়ের ঘোড়া। তাও আর কদিনের। বড় জোর মাস ছয়েক। একপাল বন্ধু নিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে অনন্ত ঘোষাল রোজ মাতলা নদীর ধার অবধি যেত। ইয়ার বক্সি নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করত মাঝ রাত্তির পর্যন্ত। তারপর আবার ঘোড়া ছুটিয়ে সোর গোলে পাড়া মাত করে বাড়ী ফিরত। বাড়ীর দাওয়ায় চাটাইয়ের উপর পাশ ফিরতে ফিরতে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেত লতিফ—টগ বগ, টগ বগ। লতিফ চুপ চাপ শুয়ে থাকত, কিন্তু মকবুল অস্থির হয়ে উঠত। জোরে জোরে পা ঠুকতো বাঁশের আগলে। গলায়-বাঁধা ঘন্টিটা ঝুন ঝুন করে বাজত।

কিন্তু ভোলে নি লতিফ। মাস ছয়েকের মধ্যেই টম টম আর ঘোড়া দুই-ই লোপাট হয়ে গেল। শুধু গাড়ী আর ঘোড়া? অমন চক-মিলানো ঘোষালদের বিরাট বাড়ী তাও হাত বদল করল। শেষকালে, সব বেশ মনে আছে লতিফের, হাড়-জিব-জিরে অনন্ত ঘোষাল এসে পাখার কারখানায় ঢুকেছিল। ষাট টাকা মাইনে, মাগ্‌গী ভাতা নিয়ে পঁচাশি।

গাছের যেমন পাতা বদলায়, শুকনো পাতা ঝরে পড়ে, নতুন চিকচিকে পাতা গজায়, তেমনি মানুষও বদলায়, পুরোনো মানুষ সরে যায়, নতুন মানুষের দল আসে। অবস্থার ফেরে নবাব হয় ফকির আর ফকির বাদশা।

মাস গেলে কুড়িয়ে বাড়িয়ে গোটা ত্রিশেক টাকা লতিফের ঠিক আসত। কোন মাসে বরাতের জোর থাকলে বেশীও।

তাছাড়া বাগানের শাকসজী তরিতরকারি মুখ ফুটে চাইলেই জুটে যেত। আর আজ। লতিফ কোমরের গেঁজে খুলে ঘাসের ওপর রাখল তিন টাকা সাড়ে তেরো আনা। তাও রোজগার নয়, ফতেমার বাজু বিক্রীর টাকা। মানুষটাই যখন চলে গেল, আবার তার গয়না।

বটগাছের ফাঁক দিয়ে রোদের ঝলক এসে পড়ল চোখের ওপর। কড়া রোদ। কপালের দু পাশ যেন টন টন করে ওঠে। ঝিম ধরে যায়। আরো একটু পিছিয়ে ডোবার ধারে এসে লতিফ বসল।

ডোবাও ঠিক নয়, মানুষের জমি কেনবার তাড়ায় এ তল্লাটের খানা ডোবা সব ভরাট হয়ে গিয়েছে। মাটি কুপিয়ে ইঁট তৈরি শুরু করেছে বাবুরা, তাই বিরাট গর্ত। কাদাভরা জল। ধারে ধারে মাটি-পোড়ানোর লালচে রং। শুধু মাটিই নয়, লতিফের মনে হল ওর নসিবটাও যেন এরা পুড়িয়ে তামাটে করে দিয়েছে। এই হঠাৎ-আসা বাবুর দঙ্গল।

কোন দিন লতিফ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। গাঁয়ের মোড়ল জনার্দন বাড়ুয্যেই খববটা শুনিয়েছিল, ও লতিফ মিঞা, শুনেছ খবব ?

লতিফ বুরুশ দিয়ে সযত্নে মকবুলের পরিচর্যা করছিল, কাজ থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি খবর বলুন তো কর্তা ? মউনীতলা হাটে মাবামারি বাপ বেটায় ? দখনে লোকের কথা আর বলবেন না, যত দেখছি তত ঘেন্না এসে যাচ্ছে।

আবে না—না, হাটের ব্যাপার নয়, জনার্দন বাড়ুয্যে মুখ থেকে দাঁতনটা বের করে নিয়েছিলেন, এ রাস্তায় বাস আসছে যে গো ! মউনীতলা থেকে শিবানীপুর পর্যন্ত।

লতিফ হেসেছিল। বিশ্বাস করে নি কথাটা। আঙুল বাড়িয়ে কাঁচা সড়ক দেখিয়ে বলেছিল, এই রাস্তায় ?

আরে রাস্তা কি এই রকম থাকবে। শহরের মতন পিচের রাস্তা হয়ে যাবে। গরমে ধুলো উড়বে না, বর্ষায় জল দাঁড়াবে না এক হাঁটু। চমৎকার বন্দোবস্ত।

অনাগত দিনের রাস্তার চেহারাটা কল্পনানেত্রেই বুঝি ফুটে উঠল বাড়ুয্যে মশাইয়ের। একদৃষ্টে তিনি পথের দিকেই চেয়ে রইলেন।

কিছুদিন পরে ঠিক বাড়ুয্যে মশাইয়ের মতনই লতিফকে এই পথের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে হয়েছিল। দলে দলে কুলি-কামিন এসে তাঁবু ফেলল পথের পাশে পাশে। কাজ করার সংগে সংগে ইনিয়ে বিনিয়ে গান শুরু করল। কোদাল আর গাঁইতির ঘায়ে দু পাশের আগাছা সাফ হয়ে গেল। মাটি খুঁড়ে আধ-হাত গর্ত। তারপর অদ্ভুত শব্দ করতে করতে স্টীম ইঞ্জিন হাজির হল এসে। রোলারের ঘায়ে মাটি পিটে সমান করে দিল। ঝুড়ি করে পাথরের কুচি ছড়াল রাস্তার উপরে। পিচের বড় বড় টিন দুম দাম করে গাছের তলায় তলায় এসে পড়ল।

অবশ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত সব দেখবার অবকাশ লতিফের তখন ছিল না। হামিদার অসুখ। খায় না দায় না, গায়ের রং পাকা পাতার মতন হলুদ, সরু সরু হাত-পা, কথা বলে চিঁ চিঁ করে। গাঁয়ের মাতব্বরেরা বললেন, হাওয়া লেগেছে। কোন্ ফাঁকে খারাপ দৃষ্টি দিয়েছে কেউ।

খারাপ দৃষ্টি? লতিফ রুখে দাঁড়িয়েছিল। আরে না না, মানুষ জনের দৃষ্টি নয়। ওঁদের কোপদৃষ্টি। কথাটা বলে চোখ ঘুরিয়ে ঝাঁকড়া বটগাছের মাথার দিকে চেয়েছিল।

বেশ বুঝতে পেরেছিল লতিফ। পরীর দৃষ্টি। জিনের নেক নজর। ওর ফুপুরও হয়েছিল একবার। গাঁয়ের রোজা আসশ্যাওড়া ডাল আছড়ে ইবলিশের বাচ্চাকে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তেমন রোজা আর এদিকে কোথায় মিলবে। পীরের সিন্নিতেও কিচ্ছু

হয় নি, রক্ষে কালীর পেসাদেও নয়। *লতিফ সোজা গিয়ে* গোবিন্দপুরের অনাদি কবরেজকে সংগে নিয়ে এসেছিল।

মাস দুয়েক। যমে মানুষে টানাটানি। ওষুধপত্তর, মালসা-পাঁচনে লতিফ ঘর ভরিয়ে ফেলল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ভোরের দিকে হামিদার গোঙানী শুরু হল। উদাস দুটি চোখের দৃষ্টি। কস বেয়ে একটু আগে খাওয়ানো ওষুধ গড়িয়ে পড়ল। লতিফ কাছে গিয়ে বসতেই শীর্ণ একটা হাত দিয়ে ঘুমন্ত ফতিমাকে ছুঁয়ে ইসারা করে একরাশ কথা বলার চেষ্টা করল। অবশ্য কথা একটি অক্ষরও আর বলা সম্ভব হয় নি: কেবল থর থর করে তার নীলচে ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠেছিল। লতিফের বুঝতে অসুবিধা হয় নি। একটা মানুষের অন্তিম প্রার্থনা। ফতিমাকে লতিফের কোলে তুলে দিয়ে বিদায় চায় হামিদা। সুখদুঃখ ব্যথাবেদনার নাগপাশ থেকে মুক্তি।

এরপর পুরো দুটো দিন লতিফ খায় নি কিছু। কেবল মাঠে মাঠে বেড়িয়েছে। পুকুরধারে কিংবা ঘন বাঁশবনের মাঝখানে চুপচাপ বসে থেকেছে দুটো হাঁটুতে মাথা রেখে। মকবুলকে দানাপানি দেবার কথাও মনে হয় নি। তারপর হঠাৎ একদিন মনে পড়েছে ফতিমার কথা। মা-হারা মেয়ে। দুনিয়াতে লতিফ ছাড়া আর ওর রইলই বা কে।

লতিফ ঘরে ফিরেছিল। ভেঙে-পড়া আগল দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধার মতন ছন্নছাড়া সংসারটাও গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। অনেক টাকা বাকি। পাড়াপড়শীদের কাছে একমুঠো ধার। গাড়ী ঠিক করে লতিফ বেরিয়ে গিয়েছিল। বেশী দূর যেতে হয় নি। মোড়ের ঝাঁকড়া কদমগাছটার কাছ বরাবর। আনকোরা নতুন বাস। ঝকঝকে গড়ন। কাগজের নিশান দিয়ে সাজিয়েছে। সারাটা বাস ধুলো উড়িয়ে তীরবেগে বাঁক নিল। লতিফ চমকে উঠেছিল, কিন্তু তার চেয়েও চমকে উঠেছিল

মকবুল। লাগাম ছিঁড়ে কচুবনের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল। শক্ত খাড়া কান, মুখের পাশে শিরাগুলো মোটা হয়ে ফুলে উঠেছিল। মকবুল ভয় পেয়েছিল। অমঙ্গলেব ছায়াই বুঝি দেখতে পেয়েছিল আগ ভাগে।

রোদটা সরে আসতেই লতিফ উঠে পড়ল। বোদের ঝাঁজ কমে এসেছে। এই বেলা গাড়ী ঠিক করে দাঁড়াতে হবে চৌমাথার মোড়ে। সওয়ারীর আশায়। আশ্চর্য। পুরো একটা হপ্তা লতিফ খদ্দেরের মুখ দেখে নি। মোট ঘাট নিয়ে অনেক লোক দাঁড়িয়েছে চৌমাথায়। কিন্তু লতিফের গাড়ীতে ওঠে নি, উঠেছে বাসের পাদানিতে। কোন রকমে পা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে, তবু আবাম করে গাড়ীতে যাবে না। যাবেই বা কি করে! গাড়ীতে উঠলেই তো কম করে নগদ আট আনা, তার চেয়ে বাস ঢের ভাল। ছ পয়সায় গোবিন্দপুরের সাঁকো পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। বিশ মিনিটের ভিতর।

গোটা দুয়েক বাস গেল পাশ কাটিয়ে। বাস বোঝাই। লতিফ পা তুলে বসে বইল চুপচাপ। মনে মনে একবার ঠিকও করে ফেলেছিল। দুত্তোর সব ছেড়ে ছুড়ে গেঞ্জিব কল কিংবা লোহাব কারখানাতেই গিয়ে ঢুকবে। তবু তো মাসেব শেষে ধবা-বাঁধা আয় থাকবে একটা। বাপ বেটিতে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বাঁচব কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে নি। মকবুলের কালো দুটি চোখেব দিকে চেয়েই কেমন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। মোলায়েম করে লাগাম ধরার হাতে শক্ত হাতুড়ী ধবতে মন কিছুতেই সায় দেয় নি।

কানের পাশ থেকে আধ-পোড়া একটা বিড়ি নিয়ে লতিফ জ্বালাবার চেষ্টা কবল। ফতুয়াব পকেট হাতড়াল দেশলাইয়ের খোঁজে। না, চালেব বাতায় গুঁজে বেখে এসেছে বোধ হয়, কিংবা দাওয়ায়। বাড়ী তো নয় যেন কবরখানা। দুদিনের জ্বরে ফতিমা

মাটি নিল। চিকিৎসা করার সুযোগও লতিফ পায় নি। অবশ্য হাতে একটি টাকা নিয়ে তো আর ডাক্তার আনা যায় না। তাও লতিফ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ডাক্তারের বাড়ী অবধি আর পৌছতে হয় নি। বুড়ো শিবতলার কাছ বরাবর পরাণ নস্কর খবরটা দিয়েছিল, ফতিমা আর নেই।

হঠাৎ একটা সোরগোলে লতিফের পুরোনো কথার খেই হারিয়ে গেল, বাতাসে মেলাল ফতিমার কচি জ্বরতপ্ত থমথমে মুখের আদল। কি ব্যাপার।

তিল ধারণের স্থান নেই বাসে। ছাদের ওপর পৌটল্লার পুঁটলির ফাঁকে ফাঁকে মানুষের সার। কি মানুষ বেড়েই গেছে আজকাল। আগেকার দিনে মেলা-পার্বণেও বোধ হয় এত লোক হত না। কিন্তু যাদের নিয়ে ঝগড়া তারা কেউ বাসে ওঠে নি। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছে সার দিয়ে। গোলগাল টোম্যাটো-প্যাটার্ণ চেহারা। হাতে গোটা পাঁচেক ছিপ। হুইল সুদ্ধ। মানুষ তিনজনকে না হয় ঠেলেঠুলে ওঠাতে পারে বাসে। বোঝার ওপব শাকের আঁটি। কিন্তু লম্বা ছিপ ঢুকবে কি করে। মানুষের জামাকাপড় ছিঁড়বে কিংবা চোখই দেবে কানা করে! কিন্তু লোকগুলোও নাছোড়বান্দা। ঠিক ছিপের জায়গা হয়ে যাবে। কোন অসুবিধা হবে না। তা নয় তো দামী হুইল সুদ্ধ ছিপ ফেলে রেখে যাবে নাকি রাস্তাব মাঝখানে? এই নিয়ে হৈ চৈ কথা কাটাকাটি। একজন বাবু পাদানিতে পা রাখবার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজিয়ে বাস ছেড়ে গেল। টাল সামলাতে তিন বাবুতে মিলে জড়াজড়ি কিছুক্ষণ, তাবপর বাসের বাপান্ত। মিনিট দুয়েক, তারপরই একটি বাবুর নজর পড়ল লতিফের গাড়ীর দিকে।

এই গাড়ী যাবি?

লতিফ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে টান হয়ে বসল। যাবে না আবার। যাবার জন্যই তো তৈরী হয়ে রয়েছে।

কোথায় যাবেন? লতিফ গাড়ী থেকে নেমে বাবুদের মুখোমুখি দাঁড়াল।

গোবিন্দপুর, জনাইয়ের খাল পর্যন্ত।

দরজা খুলে দিল লতিফ। মুখে বলল, চলে আসুন। দেড় টাকা ভাড়া পড়বে, তার একটি পয়সা কমে হবে না।

দেড় টাকা কেন, পুরোপুরি দুটাকাই দেব, কিন্তু ওই বাসের আগে পৌঁছে দিতে হবে। ব্যাটাদের লম্বা লম্বা কথা। পাঁচ বছর ছিপ নিয়ে আসা-যাওয়া করছি এ পথে, আর আজ নতুন কথা বাসে ছিপ যাবে না। হু। সব চেয়ে মোটা ভদ্রলোকটি নাক দিয়ে অদ্ভুত এক শব্দ করলেন। অনেকটা মকবুলের ধরন।

আচ্ছা করে কাগজে ব্যাটাদের ঠুকে দিতে হবে। বাসের লাইন দেব বন্ধ করে। ভেবেছে কি মনে। এই ভদ্রলোকই বাসের পাদানি থেকে পড়ো পড়ো হয়েছিলেন। দেহে চোট লাগে নি বটে, কিন্তু ইজ্জত বেশ জখম হয়েছে সেটা কথার ঝাঁজেই প্রকাশ পেল।

কিন্তু কথাগুলো লতিফের কানে যেন মধু ঢেলে দিল। বাঃ বাসের লাইন বন্ধ করে দেবে! খোদা মেহেরবান। মানুষ তো নয় বাবুরা, বেহস্ত থেকেই বুঝি নেমে এসেছেন। কিন্তু বাসের আগে ছুটবে কি করে মকবুল। যন্তর আর যানে যে অনেক তফাত। হাতল ঘোরালেই বাস ছুটবে হাওয়ার আগে কিন্তু চারটে ঠ্যাংয়ে জানোয়ার কখনও পারে এগিয়ে যেতে।

ততক্ষণে বাবুরা ছিপ সামলে গাড়ীর ভিতরে উঠে পড়েছেন। ভাববার সময় নেই। শুধু দুটো কর করে টাকাই নয়, বাবুদের খুশী রাখতে পারলে আখের ভাল হয়ে যাবে লতিফের। পাশার দানের মতন নসিবই পালটে যাবে। মনে মনে লতিফ একবার হিসাব করে নিল। একবার শিবানীপুর বাজারে আর-এক বার লখিমপুর ধানকলের সামনে। দু জায়গায় অনেকক্ষণ ধরে থামে

বাস। লোক খালি হয়ে নতুন লোক বোঝাই হয়, তার ওপর এই দু জায়গায় ড্রাইভার তরিবৎ করে চা খেতে বসে, স্পেয়ারমান বিড়িতে টানের ওপর টান দেয়। কম করেও বিশ মিনিটের ধাক্কা। প্যাসেঞ্জাররা হৈ হল্লা চেঁচামেচি শুরু করলে তবে চালু হয় বাস। কাজেই এই বিশ মিনিট লতিফকে কাজে লাগাতে হবে।

প্রথমে দুলকি চালে, তারপর চাবুকের ঘায়ে মকবুল পাগলের মতন ছুটল। সোয়ারীর কথাগুলো যেন সেও আঁচ করতে পেরেছে, বাসের আগে যেতে হবে! যন্ত্রদানবের সংগে হবে জিততে দূর পাল্লার দৌড়ে।

লতিফ ঠিকই আন্দাজ করেছিল। শিবানীপুরের বাজারে বাসের সংগে দেখা হয়ে গেল। রাস্তার পাশ ঘেঁষে তেঁতুলগাছের ছায়ায় ঝিমোচ্ছে। ড্রাইভার নেমে গেছে চায়ের দোকানে। স্পেয়ারম্যান বাসের গায়ে হেলান দিয়ে নির্বিবাদে বিড়ি ফুঁকছে।

পাশ কাটিয়ে যেতেই বাবুদের উল্লাস আর থামে না। শুধু কি চিৎকার। অশ্লীল ভাষায় গালাগালি। ছিপ দিয়ে স্পেয়ার-ম্যানকে খোঁচা দেবার চেষ্টাও করল একজন। লতিফের খেয়াল নেই। চাবুকের তাড়ায় মকবুলকে ছুটিয়ে নিয়েছে। মকবুলের ঘাড়ের চুলগুলো দুলছে বাতাসে, সমস্ত শরীর ঘামে চক চক করছে। শক্ত হাতে লাগাম ধরে লতিফ ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। আর একটুখানি। লখিমপুরের ধানকলের কাছ বরাবর যেতে পারলেই হবে। তারপর বাঁদিক দিয়ে মেঠো সড়ক আছে একটা। টানা গিয়ে পড়েছে জনাইয়ের খালে। ঘুরপথে বাসের পৌঁছোবার অনেক আগে যেতে পারবে। কিচ্ছু অসুবিধা নেই। শুকনো খটখটে চারদিক। বিশ মিনিটে মকবুল পৌঁছে যাবে।

কিন্তু একটু এগিয়েই লতিফ চমকে উঠল। কিসের একটা শব্দ আসছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই অবাক হয়ে গেল। ধুলোর ঘূর্ণি উড়িয়ে বাস বিদ্যুৎ বেগে ছুটে আসছে। প্রায় মরিয়া হয়ে।

আশ্চর্য, এত তাড়াতাড়ি তো আসার কথা নয়! তাহলে বোধ হয় শিবানীপুর বাজারে থামে নি বেশীক্ষণ। কিংবা বলা যায়, বাবুদের টিটকারির কথা হয়তো কেউ নিশ্চয় তুলেছে ড্রাইভারের কানে।

ভিতরে-বসা বাবুরাও বাসের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। উত্তেজনার সীমা নেই। একজন তো গলা বের করে তারস্বরে চীৎকার করে উঠলেন, জোরে মিয়াসায়েব, বাসের আগে পৌঁছোতেই হবে। যেমন করেই হোক। নগদ পাঁচ টাকা দেবো ভাড়া।

কেমন জড়ানো গলার আওয়াজ। নেশা ভাং করছে কি-না কে জানে! তা করুক। পাঁচটা করকরে টাকা কম কথা! কোনরকমে বাঁদিকের মেঠো রাস্তায় একবার নামতে পারলে হয়। লতিফ প্রাণপণ শক্তিতে চাবুক চালাল। বাতাস কেটে সাঁই করে একটা শব্দ হল। ঘাড়টা একবার ঘুরিয়েই মকবুল পাগলের মতন ছুটতে শুরু করল।

কিন্তু অসম্ভব। ক্রমেই এগিয়ে আসছে বাসের আওয়াজ। ততই জোর হচ্ছে বাবুদের চীৎকার।

লতিফ মতলব ঠিক করে ফেলল। দু ধারে শিরীষ আর কৃষ্ণচূড়া গাছের সার। পিচ-ঢাকা রাস্তার সরু ফালি। লতিফ বাঁদিক থেকে সরে রাস্তার মাঝ বরাবর এসে উঠল। অবিরত হর্নের আওয়াজ। ড্রাইভারের গালিগালাজ। বাসের সোয়ারীদের খিস্তি কিন্তু সেই সংগে বাবুদের পিঠচাপড়ানো কানে এল। সাবাস মিয়াসায়েব। ঠিক আছে। রাস্তা ছেড়ো না ব্যাটাকে।

সেকেণ্ডের মধ্যে লতিফের মনের পর্দায় দ্রুত ছবির পর ছবি ফুটে উঠল। ইয়াকুব চৌধুরী আর তার গাড়ী, অনন্ত ঘোষালের টম টম সব সরে গিয়েছে পিছনে। লতিফ আর মকবুলকে কেউ

পাশ কাটিয়ে যেতে পারে নি। আর আজ কোথাকার কে উড়ে এসে জুড়ে বসবে। তাও কখনও হতে পারে।

আবার চাবুকের শব্দ। মকবুলের ল্যাজ খাড়া হয়ে উঠল। লতিফ আরো ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে।

কান-ফাটানো প্রচণ্ড একটা শব্দ। সারা গাড়ীটা দুলে উঠল। মকবুল ছিটকে গিয়ে পড়ল রাস্তায় ওপর। চারটে পা প্রসারিত করে বাতাসে কি যেন শুকলো তারপর চীৎকার করে স্তব্ধ হয়ে গেল।

লতিফ প্রথমে কোচবাক্স থেকে গড়িয়ে পড়ল গাড়ীর ছাদের ওপব, তারপর টাল সামলাতে না পেরে রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বাসের সামনের দুটো চাকা তার সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে আবর্তিত হল। ব্রেকের কসরতে চাপ চাপ রক্তমাখা চাকা দুটো চেপে বসল রাস্তার ওপরে।

বাস থেমে গেল। আশ্চর্য! ছেঁড়া-লাগাম-ধরা লতিফের শীর্ণ শিরাবহুল হাত দুটো তখনও অবধি কাঁপছে থর থর করে।



এই লেখকের ঃ

ইরাবতী (২য় সং)
উপকূল (২য় সং)
আরাকান
অন্ততমা (২য় সং)
নারী ও নগরী (২য় সং)
সপ্ত-কন্যার কাহিনী
প্রান্তিক
মৃত্তিকার রং
পূর্বরাগ
সুরবাহার (২য় সং)
স্বপ্নমঞ্জরী
মৃগশিরা
পঙ্করাগ
বনকপোতী
অবরোধ